وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

‘জালেমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তিনি তো তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন মাত্র- ঐ দিন পর্যন্ত, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে’ (সূরা ইবরাহীম, ১৪)।

● ৭ম বর্ষ ● ১১ সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০২৩

Web : www.al-itisam.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلي الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة: ٧٠، صفر و ربيع الأول ١٤٤٥هـ/ سبتمبر ٢٠٢٣م العدد: ١١، الجزء: ٨٣
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف
التحرير و التنسيق: لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840 E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

ওর্তাকয় মসজিদ, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক : বিখ্যাত বসফরাস প্রণালির তীর ঘেঁসে অবস্থিত মসজিদটি ১৮৫৫ সালে উসমানী সুলতান আব্দুল মজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটিতে দুটি সুউচ্চ মিনার ও একটি বিশালাকার গম্বুজ রয়েছে। নিওক্লাসিক্যাল স্থাপত্যশৈলিতে নির্মিত বর্গাকার মসজিদটির অভ্যন্তরভাগ সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফি দ্বারা সজ্জিত, যা সুলতান আব্দুল মজিদ স্বহস্তে খোঁদাই করেছিলেন।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৫ || ঈসায়ী ২০২৩ || বঙ্গীয় ১৪৩০

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	১৫ ছফর	শুক্রবার	৪:২৩	৫:৪০	১১:৫৮	৩:২৬	৬:১৭	৭:৩৪
০৫ ,,	১৯ ,,	মঙ্গলবার	৪:২৫	৫:৪১	১১:৫৭	৩:২৫	৬:১৩	৭:৩০
১০ ,,	২৪ ,,	রবিবার	৪:২৭	৫:৪৩	১১:৫৫	৩:২৩	৬:০৮	৭:২৪
১৫ ,,	২৯ ,,	শুক্রবার	৪:২৯	৫:৪৪	১১:৫৪	৩:২১	৬:০৩	৭:১৮
২০ ,,	০৪ রবী: আউ:	বুধবার	৪:৩১	৫:৪৬	১১:৫২	৩:১৮	৫:৫৮	৭:১৩
২৫ ,,	০৯ ,,	সোমবার	৪:৩৩	৫:৪৮	১১:৫০	৩:১৫	৫:৫৩	৭:০৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	০	-১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	-১	০
নরসিংদী	-২	-২	-১
কিশোরগঞ্জ	-৩	-২	-১
টাঙ্গাইল	+১	+১	+২
ফরিদপুর	+২	+২	+৩
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৪
মুন্সিগঞ্জ	০	-১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+৪
মাদারীপুর	+২	+১	+২
মানিকগঞ্জ	+১	+১	+২
শরিয়তপুর	+২	০	+১

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+১
শেরপুর	০	০	+৩
জামালপুর	০	০	+৩
নেত্রকোনা	+৩	-৩	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-৪	-৫	-৬
কক্সবাজার			
খাগড়াছড়ি	-৬	-৭	-৬
রাঙ্গামাটি	-৬	-৭	-৭
বান্দরবান	-৫	-৭	-৮
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩
নোয়াখালী	-২	-৩	-৩
লক্ষীপুর	-১	০	-১
চাঁদপুর	০	০	-১
ফেনী	-৩	-৪	-৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৫
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-৩
মৌলভীবাজার	-৭	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৫	-৫	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৭	+১০
নাটোর	+৫	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৫
সিরাজগঞ্জ	+২	+২	+৪
বগুড়া	+২	+৪	+৫
নওগাঁ	+৪	+৫	+৭
জয়পুরহাট	+৩	+৪	+৭

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	+২	+২	+৭
দিনাজপুর	+৪	+৫	+৯
গাইবান্ধা	+১	+২	+৫
কুড়িগ্রাম	০	+১	+৫
লালমনিরহাট	+১	+১	+৬
নীলফামারী	+৩	+৪	+৯
পঞ্চগড়	+৩	+৪	+১১
ঠাকুরগাঁও	+৪	+৫	+১০

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৫	+৪	+৩
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২
সাতক্ষীরা	+৭	+৬	+৫
যশোর	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৪	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৬	+৮
মাগুরা	+৪	+৪	+৪
নড়াইল	+৪	+৪	+৪

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+২	+১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	-১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১
ঝালকাঠি	+২	+১	০
ভোলা	০	০	-২
বরগুনা	+৩	+২	০

৭ম বর্ষ
১১তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২৩
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০
ছফর-রবী: আউয়াল
১৪৪৫

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

■ প্রধান সম্পাদক,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০

■ ফাতাওয়া হটলাইন : ০১৪০৭-০২১৮৪২ (সকাল ৮:০০মি. থেকে সকাল ১০:০০মি.)

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016

■ ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৪০৭-০২১৮২২

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	২২৫/-	৪৫০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৪০০/-	৮০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ দারসে হাদীছ
» ছাদাক্বা কি শুধু আর্থিক দানে সীমাবদ্ধ? ০৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

◈ প্রবন্ধ
» আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে? (শেষ পর্ব) ০৬
মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
» কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা (পর্ব-৩) ০৯
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কারা? ১২
মূল : আলাবী ইবনু আব্দুল কাদের আস-সাক্বক্বাফ
অনুবাদ : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ
» কিশোর গ্যাং : কারণ, ধরন ও প্রতিকার (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৫
-মো. হাসিম আলী
» ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা বিদআত ১৮
-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী
» শিরক নিয়ে অজানা কিছু কথা ২১
-সাঈদুর রহমান
» বাংলাদেশে সমকামিতার গতি-প্রকৃতি : ভয়াবহতা, শাস্তি ও পরিত্রাণের উপায় ২৩
-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ
» কিতাবুল ঈমান-২য় পর্ব (মিন্নাতুল বারী-২৯তম পর্ব) ২৮
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» ইসলাম প্রচারে তারুণ্যের অবদান ৩০
-মাযহারুল ইসলাম

◈ হারামাইনের মিম্বার থেকে
» মাদকদ্রব্যের কুফল ও তার প্রতিরোধে করণীয় ৩৩
-অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

◈ তরুণ প্রতিভা
» তাহলে কবে তুমি নিজেকে চিনবে? ৩৬
-মূল : ড. আলী তানতাবী
অনুবাদ : সাব্বির আহমাদ

◈ দিশারী
» আমাদের দুনিয়ার জীবন : ভুল পথচলা ৩৯
-মোশতাক আহমাদ

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা
» গ্রন্থ পরিচিতি-১৫ : আল-লামহাত ৪০
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ কবিতা ৪১

◈ সংবাদ ৪২

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে পরিণত করুন

জনগণ দেশের জন্য মোটেও বোঝা নয়; বরং দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সন্তানসন্ততি মহান আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। তিনি অনুগ্রহ করে কাউকে মেয়ে, কাউকে ছেলে আবার কাউকে উভয়ই দান করে থাকেন *(দ্র. আশ-শূরা, ৪২/৪৯-৫০)*। সন্তান গ্রহণের প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করে। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমরা অধিক সন্তানপ্রসবা মমতাময়ী নারীকে বিয়ে করো। কেননা আমি অন্যান্য উম্মতের কাছে তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করব' *(নাসাঈ, হা/৩২২৭)*।

মহান আল্লাহ প্রত্যেককে তার রিযিক্ব দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকেন। এরশাদ হচ্ছে, 'আর যমীনে বিচরণশীল এমন কোনো জীব নেই, যার রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহর উপর নেই। তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সবকিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে' *(হূদ, ১১/৬)*। অন্যত্র মহান আল্লাহর দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, 'আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজেদের রিযিক্ব নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহই তাদের রিযিক্ব দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক্ব দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ' *(আল-ইসরা, ১৭/৩১)*। উল্লেখ্য, 'রিযিক্ব' কথাটি দ্বারা কেবল টাকাপয়সা, খাদ্য-পানীয় উদ্দেশ্য নয়; বরং শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণ যে কত বড় শক্তি, তা আমাদের প্রবাসীদের দিকে তাকালেই সহজে অনুমেয়; বিদায়ী অর্থবছরে দেশে ২ হাজার ১৬১ কোটি ৬ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার সমপরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ২৩ লাখ ৪৪ হাজার ৭৫৭ কোটি টাকা। এ হিসাবে প্রতিদিন গড়ে দেশে এসেছে ৫৯ কোটি ২১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স। বর্তমান দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়ই হচ্ছে রেমিট্যান্স।

এক্ষেত্রে আমরা জাপানের দিকেও একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি। দেশটি জন্মহার বাড়াতে শিশু সুরক্ষা খাতে নানান প্রণোদনার পাশাপাশি প্রতিবছর আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে। কারণ দেশটি ভয়াবহ জনশক্তির অভাবে ভুগছে। নিম্নমুখী জন্মহার জাপানের সমাজ এবং গোটা অর্থনীতির জন্য অশনি সংকেতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের আরো অনেক উন্নত দেশ এভাবে কর্মক্ষম জনসংখ্যার অভাবে ভুগছে। জনগণ যে কত বড় সম্পদ হতে পারে, তা তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

পরিসংখ্যার ব্যুরো (বিবিএস)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন। মোট জনসংখ্যার ৪ ভাগের ১ ভাগ এখন তরুণ, যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। মোট জনগোষ্ঠীর ৬২ শতাংশ অর্থাৎ ১০ কোটি ৫০ লাখ মানুষই এখন কর্মক্ষম। আরেকটি সরকারি তথ্য মতে, বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা এখন ১২ কোটি ৩৩ লাখ। সেই হিসাবে বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড (Demographic Dividend) বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসকালের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে, যা একটি রাষ্ট্রে সবসময় আসে না। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলতে বুঝায়, কোনো একটি দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যার শ্রমশক্তিতে পরিণত হওয়া। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপি)-এর মতে, ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী মানুষকে কর্মক্ষম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন তরুণ জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র। এ অঞ্চলের ৪৫টি দেশের জনসংখ্যাভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি বলেছে, বাংলাদেশ তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাস গ্রহণ করে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। চীন সেই তালিকার একটি বড় উদাহরণ, যেখানে আশির দশক থেকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এটাকে কাজে লাগিয়ে তারা আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত এ বিশেষ নেয়ামতকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে (১) দেশে চাহিদামাফিক বিভিন্ন ধরনের কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে হবে এবং কর্মক্ষম সকলকেই কাজে যুক্ত করতে হবে, কাউকে বেকার রাখা যাবে না। কর্মসংস্থান তৈরিতে সরকার ও জনগণ সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। (২) দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ বিশেষ কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে। বিশেষ করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব সামনে রেখে আইটি ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বর্তমান বাজারব্যবস্থা সামনে রেখে তরুণ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। (৪) দেশে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের ধীরে ধীরে ছাঁটাই করে সেখানে দেশী শ্রমিক নিয়োগ দিতে হবে। কারণ আমাদের রেমিট্যান্স-যোদ্ধারা ঘামঝরা পরিশ্রম করে যা আনছেন, বিদেশী শ্রমিকরা সেই তুলনায় আমাদের দেশ থেকে কিন্তু কম নিয়ে যাচ্ছেন না। (৫) বিশ্ব শ্রমবাজারে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চাহিদা বেশি, সেগুলো যাচাই করে মানবসম্পদ তৈরি করতে হবে। (৬) বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করে সেখানে ভালো ভালো পেশা ও পদে লোক পাঠাতে হবে, তাহলে অর্থ ও সম্মান দু'টোই হবে ইনশা-আল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতিসহ সার্বিক সমৃদ্ধি দান করুন। আমীন!

ছাদাক্বা কি শুধু আর্থিক দানে সীমাবদ্ধ?

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ.

সরল অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি গ্রন্থিলতা তার উপর ছাদাক্বা। প্রতিদিনের সূর্য উদয়ে সে যে দুইজনের মধ্যে মীমাংসা করে, তা তার জন্য ছাদাক্বা। মানুষকে বাহনে উঠতে বা মালপত্র উঠাতে তোমার সাহায্য ছাদাক্বা। পবিত্র বাক্য ছাদাক্বা। ছালাতের উদ্দেশ্যে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বা আর রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা'।[১]

ব্যাখ্যা : নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০টি গ্রন্থিলতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২] কাজেই একটি বছরের প্রতিদিনের সূর্যোদয়ে প্রত্যেকের ছাদাক্বা করা উচিত। অর্থাৎ অন্তত বছরে ৩৬০ বার ছাদাক্বা করা উচিত। ছাদাক্বা শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি শুধু কল্যাণকর ও উপকারী ক্ষেত্রে সম্পদের ব্যয়ের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। যে সকল কাজ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহায়ক হয়, তার প্রতিটি কাজই ছাদাক্বা হিসেবে বিবেচিত হবে। আল্লাহর আনুগত্যের যে কোনো কাজ বা ইবাদত যদি তাঁর প্রতি গভীর দাসত্বের নিদর্শন হিসেবে কাজ করে, তবে তা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে। উক্ত আমলের প্রত্যেকটিই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বান্দার গভীর নিষ্ঠার প্রমাণ বহন করে।

বিবাদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসাও ছাদাক্বা। যদি বিবাদমান পক্ষ কারো নিকট মীমাংসার জন্য আসে এবং সে যদি তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দেয়, তবে তা ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। শরীআতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো কাজই ছাদাক্বা। তবে যদি শরীআতবিরোধী হয়, তাহলে অন্যায় ও অবিচার হিসেবে গণ্য হবে। কিছু ছাদাক্বা এমন আছে, যার সুফল শুধু দাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর কিছু ছাদাক্বা এমন আছে যার সুফল দাতা এবং তার চারপাশের লোককে শামিল করে। আলোচ্য হাদীছে ছাদাক্বা ঐ সকল ইবাদত ও আমলকে শামিল করে, যা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে আসে; যা তাদেরকে একতাবদ্ধ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সকলের মনকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রধান নিয়ামকের ভূমিকায় থাকে এই পবিত্র বাক্যের ছাদাক্বা। এই বাক্যের শিক্ষা তাদেরকে স্থায়ী ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে।

বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচারে সত্য বলাই হলো জিহ্বা নামক নেয়ামতের শুকরিয়া। সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে সে আলোকে বিচার করা হলো বিবেক নামক নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। যে বিবেক তাকে সত্য গ্রহণ ও তদনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনায় সাহায্য করেছে। সৎপথ লাভ ও বিচারিক সক্ষমতা অর্জন নেয়ামতের শুকরিয়া হলো বিবাদমান পক্ষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা। যদি এভাবে আল্লাহর নেয়ামতের আলোচনা চলতে থাকে, তবে গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমাদের এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, জিহ্বা যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান মাধ্যম, তেমনি পরস্পর বিরোধী দুটি পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এটি মুসলিম সমাজের জন্য একটি বড় কল্যাণকর ছাদাক্বা।

এখানে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষকে আল্লাহ তাআলার এক মহান নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার দেহের শিরা-উপশিরা, অস্থি-মজ্জা, হাড়-হাড্ডি, গ্রন্থিলতা ইত্যাদি সবই উক্ত নেয়ামতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ মানুষকে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত, তাকে সৃষ্টিতে তাঁর একক ক্ষমতা, তার দেহের সংযোজন ও শৃঙ্খলায় তাঁর অভিনবত্ব ও অলৌকিকত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে তার শক্তি ও সম্ভাব্যতার অপূর্ণতা ও অপারগতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। আল-কুরআনের বেশ কয়েক স্থানে এই ইলাহী নেয়ামতের স্মৃতিচারণ করা হয়েছে এভাবে, ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করে এনেছেন, যে সম্পর্কে তোমরা কিছুই জানতে না। অতঃপর তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দান করেছেন। আশা করা যায়, তোমরা শুকরিয়া আদায় করবে' *(আন-নাহল, ১৬/৭৮)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ - الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ - فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ 'হে মানুষ! কোন জিনিস তোমার সম্মানিত প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাকে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমার কাঠামোকে সুগঠিত করেছেন এবং তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি যেভাবে চেয়েছেন, সে আকৃতিতে তোমাকে গঠন করেছেন' *(আল-ইনফিত্বার, ৮২/৬-৮)*।

---

* প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৯৮৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৯; মিশকাত, হা/১৮৯৬।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৭।

এটি এমন একটি মহান নেয়ামত, যা মানুষকে আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠ ও কৃতজ্ঞ হতে বাধ্য করে আর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় নেয়ামতকে বরকতময় ও স্থায়ী করতে সহায়তা করে। কিছু মানুষ মনে করে, নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুধু জিহ্বার সাথে সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা হলো এটি নেয়ামতের পূর্ণাঙ্গ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যথেষ্ট নয়। যদিও শারঈ দৃষ্টিতে জিহ্বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। তাই এর সাথে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুকরিয়া আদায় যুক্ত হওয়া জরুরী। এভাবে স্রষ্টার জন্য সর্বোত্তম পর্যায়ের শুকরিয়া আদায় বাস্তবায়িত হতে পারে।

এটি শরীআতের এমন নীতি, যার উপর ভিত্তি করে যদি কোনো ব্যক্তি বিবাদমান মানুষের মধ্যে এমন মীমাংসা করে যা শারঈ নীতির বিরোধী, তবে তা কখনোই ন্যায়বিচার হিসেবে গণ্য হবে না। বরং এটি অবশ্যই যুলম, অবিচার ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। এরূপ অনৈতিক বিচারক যদি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তার এই বিচার আল্লাহর বিচারের অনুরূপ অথবা তাঁর বিচারের চাইতে উত্তম; তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে নিজেকে আল্লাহর আয়াত 'আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?' *(আল-মায়েদা, ৫/৫০)* এর অস্বীকারকারী সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ বিচারের বিবেচনায় আল্লাহর চাইতে উত্তম কেউ নয়; তবে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ব্যতীত কেউ এটা অনুধাবন করতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছেন, তার পক্ষে এই অনুধাবন অর্জন সম্ভব নয়। বরং শয়তান তার অন্যায় কাজগুলোকে তার নিকট মনোরম করে উপস্থাপন করে। ফলে সে তার অপকর্মকেই কল্যাণকর কাজ হিসেবে দেখতে পায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ধরনের আচরণ ও বিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন।

দুইজনের মধ্যে বিচারকের বিচার অবশ্যই তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য হতে হবে। সে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিয়োগকৃত হোক অথবা না হোক। কখনো কখনো এক পক্ষের সঠিক হওয়ার কারণ তার নিকট স্পষ্ট নাও হতে পারে। যখন কোনো এক পক্ষের প্রাধান্য পাওয়া স্পষ্ট হয় না; তখন বিচারকের উচিত হবে এমনভাবে বিচার করা যাতে উভয় পক্ষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত হয়। তিনি তার সক্ষমতা অনুযায়ী উভয়ের কল্যাণ কামনা করে ন্যায়বিচার করবেন। তবে এটি তার জন্য ছাদাক্বা হিসেবে বিবেচিত হবে।

যদি কারও অন্তরে কার্পণ্য অথবা অর্থের প্রতি লোভ থাকে, তবে তার পক্ষে পক্ষপাতমুক্ত বিচার করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ যখন কোনো কৃপণ ব্যক্তি বিচারকার্য পরিচালনা করবে, তখন সে ন্যায়বিচার করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে' *(আন-নিসা, ৪/১২৮)*।

এই আয়াতে পক্ষপাতমুক্ত বিচারকার্য পরিচালনার কথা বলে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন লোভের বশবর্তী হয়ে পক্ষপাতদুষ্ট বিচার না করে। কোনো পক্ষেরই তার অধিকারের সম্পূর্ণটা চাওয়া উচিত নয়। যদি এক পক্ষ তার পূর্ণ অধিকার চায়, তবে অপর পক্ষও তার পূর্ণ অধিকার চাইবে। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসা অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রত্যেককেই তার দাবীর ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে। যখন ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হয় না, তখন তথ্য-প্রমাণ অথবা পক্ষদ্বয়ের অবস্থানের কারণে বিচার্য বিষয়টি বিচারকের নিকট অস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন কল্যাণের চাহিদার আলোকে বিচার করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

একজন মানুষকে বাহনে আরোহণ বা বাহনের উপর মালামাল উঠাতে সাহায্য করা ছাদাক্বা। সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মানবিক দায়িত্ব গ্রহণ করার এক অনুপম উদাহরণ। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টিগতভাবে কোনো ব্যক্তিই তার সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। বরং কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়। জীবনে চলাচল ও লেনদেনের যে কোনো ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অভাব দেখা দিতে পারে। তবে যখন তার দায়িত্ব পালনে তার ভাইয়ের সাহায্য পায় কিংবা তার ভাইয়ের সাহায্যে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটে যায়, তখন মুমিনদের মধ্যে ভালোবাসা বিস্তার লাভ করে। কোনো ব্যক্তি বাহনে উঠতে অক্ষম হলে বা মালামাল বাহনে উঠাতে অপারগ হলে তাকে সাহায্য করা ছাদাক্বা।

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া ছাদাক্বা: যখন রাস্তায় এমন বস্তু পড়ে থাকে, যা পথচারীর জন্য কষ্টদায়ক তা সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা। সেটা ইট, পাথর, কাচ, কাঁটা, ফলের খোসা ইত্যাদির যে কোনোটি হতে পারে। ঝুলন্ত কাপড় কারও বিপদের কারণ হলে তা উঠাতে বলাও ছাদাক্বা। মোদ্দাকথা, রাস্তায় পড়ে থাকা ক্ষতিকারক বস্তু সরিয়ে ফেলা ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে। যদি কেউ সেটা সরিয়ে ফেলে তবে সে ছাদাক্বাকারী হিসেবে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা আর রাস্তায় কষ্টদায়ক বস্তু ফেলা অন্যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এমন তিনটি স্থানে মল ত্যাগ করা থেকে বিরত থাক, যেখানে মলত্যাগ অভিশাপের কারণ হয়— (ক) মানুষের সমবেত হওয়ার স্থান, (খ) রাস্তার মধ্যবর্তী স্থান ও (গ) গাছের ছায়া'।[৩]

যারা ময়লা-আবর্জনা রাস্তায় নিক্ষেপ করে বা নিষ্কাশনের বিকল্প ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাজারের দিকে পানি ছেড়ে, দেয় যাতে মানুষ কষ্ট পায় ইত্যাদি অন্যায় বা পাপ হিসেবে গণ্য হবে। এখানে পানি বলতে ব্যবহৃত পানিকে বুঝানো হয়েছে। মাটির তলদেশের পানিকে বোঝানো হয়নি। এখন কোথাও

৩. আবূ দাঊদ, হা/২৬, হাসান।

যদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাটি থেকে পানি বের হয় সেক্ষেত্রে কাউকে দায়ী করা যাবে না। কারণ মাটির অভ্যন্তরে পানির সংরক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ﴾ ‘অতঃপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। সেই পানি আমি তোমাদেরকে পান করালাম। তোমরা কিন্তু এই পানির সংরক্ষণকারী নও’ *(আল-হিজর, ১৫/২২)*।

যারা পানির প্রবাহ উন্মুক্ত করে এর ব্যবহারে সীমালঙ্ঘন করে এবং এর গতিপথের ক্ষেত্রে কোনো পরোয়া না করে তারা সমগ্র উম্মতের জন্য ক্ষতিকারক। কারণ পানি সকল মানুষের ব্যবহারের বিষয়। যখন কেউ এর অপব্যবহার করবে, তার অপচয়ে কোনো পরোয়া করবে না তখন সে অপব্যয়কারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর আল্লাহ অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় সে পাপী হবে। কেননা পানির অপচয় ও অপব্যয়ে জড়িত ব্যক্তিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ ‘নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই’ *(আল-ইসরা, ১৭/২৭)*।

আর এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট ওযূ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি তাকে (ওযূর প্রতিটি অঙ্গ) তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘এইভাবে ওযূ করতে হয়। যে এর বেশি করল সে অন্যায় করল, সীমালঙ্ঘন করল এবং নিজের প্রতি যুলম করল’।[৪] আর এর অপব্যবহারের ক্ষতির সম্মুখীন হয় সাধারণ জনগণ। মোদ্দাকথা, যারা রাস্তায় বা জনসাধারণের গতিপথে এমন কিছু নিক্ষেপ করবে যা তাদের চলাচলে বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে তারা অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। আর যারা রাস্তা থেকে এসব কষ্টদায়ক বস্তু দূর করবে, তারা ছাদাক্বাকারীর মর্যাদা অর্জন করবে।

আর পবিত্র বাক্য হলো ছাদাক্বা। কালেমা ত্বায়্যেবা বা পবিত্র বাক্য দুইভাগে বিভক্ত— (ক) মৌলিক পবিত্র বাক্য ও (খ) ফলাফলের বিচারে পবিত্র বাক্য।

মৌলিক পবিত্র বাক্য হলো আল্লাহর যিকির, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। মৌলিক পবিত্র বাক্য মানুষকে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হতে উৎসাহিত করে। এটি মানুষের কল্যাণ লাভ এবং প্রতিদান অর্জন নিশ্চিত করে। এর ফযীলতে কুরআন ও হাদীছে অনেক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উছমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীছে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়’।[৫]

আর ফলাফলের বিচারে পবিত্র বাক্য হলো যে কোনো বৈধ বাক্য। যখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে কাউকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাকে আনন্দিত করা। এই জাতীয় বাক্য মৌলিকভাবে কল্যাণকর না হলেও ফলাফলের বিচারে কল্যাণকর। কারণ এটি একজন মানুষের মধ্যে এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, যার ফলে সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আগ্রহী হয়। যেমন- মানুষের প্রয়োজন মিটায় এমন সুপারিশ, বিপদে তাকে সান্ত্বনা প্রদান, আল্লাহর নৈকট্য লাভে সদুপদেশ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ, আনন্দদায়ক উপদেশ যা তার আত্মাকে প্রশান্তি দেয়। তাই কালেমা ত্বায়্যেবা বা পবিত্র বাক্য সাধারণ বাক্য, যা যে কোনো কল্যাণকর বাক্যকেই শামিল করে; চাই তা মৌলিকভাবে পবিত্র হোক কিংবা ফলাফলের বিচারে পবিত্র হোক।

পবিত্র বাক্য হলো ছাদাক্বার মধ্যে সব থেকে বড় ছাদাক্বা। এই বাক্যের বাহ্যিক প্রভাব কত মানুষের উপর যে রয়েছে, তার কোনো হিসাব নেই। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নীতিবাক্যের প্রভাবের বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জাযান নামক একজন সালাফ তার জীবনের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি সুমধর কণ্ঠের একজন যুবক ছিলাম। আমি একতারা বাজাতে খুব দক্ষ ছিলাম। আমি আমার বন্ধুদের সাথে ছিলাম। আমরা ভিজানো খেজুর খাচ্ছিলাম আর গান করছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের নিকট আসলেন। তিনি একতারাটি মেঝেতে আঘাত করে ভেঙে দিয়ে বললেন, হে যুবক! তোমার কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! যদি তোমার কণ্ঠে কুরআনের আওয়ায শুনা যেত, তবে তুমি এমন মহান ব্যক্তি হতে! অতঃপর তিনি চলে গেলেন। আমি আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তারা বললেন, ইনি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। তারপর আল্লাহ আমার হৃদয়ে তওবার অনুপ্রেরণা দান করলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নিকট দৌঁড়ে গেলাম এবং তাঁর কাপড় ধরে নিলাম। তিনি আমার সামনে এসে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন, তাকে স্বাগত যাকে আল্লাহ ভালোবেসেছেন! হে পাঠক! আপনার ভেবে দেখা উচিত এই লোকটি যত সৎকাজ করবেন তার সবই আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। এর কারণ হলো আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পবিত্র বাক্য তাঁর হেদায়াতের কারণ হয়েছে।[৬] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘নিশ্চয় জান্নাতে একটি কক্ষ আছে যার বাহির থেকে ভিতর এবং ভিতর থেকে বাহির দেখা যায়’।

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ১৭ নং পৃষ্ঠায়)

৪. আবূ দাঊদ, হা/১৩৫, হাসান; নাসাঈ, হা/১৪০।

৫. ছহীহ বুখারী, হা/৫০২৭।

৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/২৮১।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত : দলীয় মোড়কে নাকি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে?

মূল : আলী ইবনে হাসান আল-হালাবী আল-আছারী
*অনুবাদ : আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী**

(শেষ পর্ব)

আমরা ‘ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ: কিছু সংশয় ও তার জবাব’-এ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-এর পক্ষ থেকে অনেক বক্তব্য দেখেছি, যেখানে তিনি দলাদলি হতে সতর্ক করেছেন এবং দলাদলির আহ্বায়ক ও ধ্বজাধারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।[১]

কিন্তু কেউ এসে যদি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ-এর পক্ষ থেকে বলতে চায়, তিনি ছিলেন ‘একটি জামা‘আতের নেতা, যে জামা‘আত তার আদেশে চলত, তার পরামর্শে কাজ করত এবং তার মতাদর্শ অনুযায়ী চলত’!![২] তিনি ছিলেন নিষিদ্ধ দলাদলির অর্থে ‘দলীয় কর্মকাণ্ডের অগ্রদূত’![৩]

তাহলে তা হবে অবান্তর কথা, যেখান থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ এ বক্তব্যের প্রবক্তা যেসব উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন, সেগুলো চিন্তা করলে দেখা যায় যে, উদ্ধৃতিগুলোকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে, সেগুলোতে রয়েছে স্পষ্ট কৃত্রিমতা এবং পরিষ্কার অপব্যাখ্যা। যেমন- শায়খ তার ‘জামা‘আত’ (جَمَاعَته)-এর নিকট পাঠালেন! শায়খ এবং ‘তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ’ (أَصْحَابُه) বের হলেন! কেউ কেউ তাকে তার অনেক ‘অনুসারী’ (أَتْبَاعُه) থাকার কারণে হিংসা করতেন! এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

এগুলো আসলে কী?

এই শব্দগুলো কি বর্তমান হিযবী বা দলীয় চিন্তাচেতনার আলোকে বুঝতে হবে? নাকি দু’টি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনার আলোকে বুঝতে হবে, যে দু’টি বিষয়ের মধ্যে মোটেও গুলিয়ে ফেলা যাবে না? বিষয় দু’টি হচ্ছে,

এক. পারস্পরিক শরী‘আতসিদ্ধ সহযোগিতা।

দুই. দলাদলির নিন্দা।

এই দু’টি বিষয়ই শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহর দাওয়াত ও চিন্তাচেতনার মানহাজে সুস্পষ্ট। তার কাছ

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. যদি তার এ মর্মে প্রদত্ত সকল বক্তব্য সংকলন করা যায়, তাহলে সংকলক একটি মধ্যম আকারের বই বের করতে পারবেন, উদাহরণস্বরূপ তিনি সেই বইয়ের নাম দিতে পারবেন— ‘ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং দলবাজিমূলক কর্মকাণ্ডের নব্যতা’।

২. ‘মাজাল্লাতুল ফুরক্বান’, সংখ্যা: ১২, পৃ. ৮, প্রবন্ধ শিরোনাম: শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং দলীয় কর্মকাণ্ড!

৩. ‘নিষিদ্ধ অর্থে’ একথাটি আমি এজন্য বলেছি যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। আর শরী‘আতসিদ্ধ যৌথ কর্মকাণ্ড হচ্ছে, পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগিতা বজায় রেখে চলা এবং ব্যাপকার্থে ইসলামের ছায়াতলে থেকে স্পষ্ট মানহাজ অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ করা, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই এবং নেই কোনো অস্বচ্ছতা।

‘তানযীম’ (সংগঠন) শব্দটিও ঠিক এরকমই। শাব্দিক অর্থ মতৈক্য এবং গন্ডগোল থেকে দূরে থাকা। আর এই অর্থে আমাদের পুরো দ্বীনটাই ‘তানযীম’ এবং সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই।

কিন্তু শব্দটিকে দলাদলি অর্থে ব্যবহার করলে তা হবে বাতিল ও নবাবিষ্কৃত পরিভাষা, শরী‘আতে যার কোনো ভিত্তি নেই এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের এ ব্যাপারে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না।

শব্দটির অর্থ যদি নেওয়া হয় ঐক্য ও পারস্পরিক ভালোবাসা এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত, তাহলে অর্থের দিক থেকে তা গ্রহণযোগ্য হলেও পারিভাষিক ব্যবহার হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিবর্তে কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত শরী‘আতসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা উচিত। আর তা হচ্ছে— ‘তা‘আউন’ (التَّعَاوُن)।

এরপর ‘তানযীম’ বা সংগঠনের দাঈগণের উদ্দেশ্যে বলব, এই ‘তানযীম’ কি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নাকি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়?

যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে দলীল থাকতে হবে। কেননা যতো ছোট হোক না কেন দ্বীনের প্রত্যেকটি অনুষঙ্গের পক্ষেই কুরআন-হাদীছের দলীল রয়েছে।

আর যদি দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তা তার দাঈ ও নেতৃবর্গের দিকেই প্রত্যাখ্যাত হবে, তারা যতোই তা সুন্দর করে উপস্থাপন করুক না কেন। একথা গোপন নয় যে, ‘যতো সমস্যা সব নির্দিষ্ট কিছু রেওয়াজ ও সেগুলো মেনে চলা এবং প্রচলিত নানা পথ ও নতুন নতুন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরার মধ্যে’ *(আল-মাদারিজ, ৩/১৭৩)*।

www.al-itisam.com

থেকেই তো আমরা শিখেছি। তার চিন্তাচেতনার আলোকেই আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছি।

ইতোপূর্বে আমরা 'জামা'আত'-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ তুলে ধরেছি। ফলে তা পুনর্বার আর উল্লেখ করতে চাই না।

আর শায়খের 'অনুসারীগণ' (أَتْبَاع) ও সঙ্গী-সাথীগণ' (أَصْحَاب) থাকার অর্থ আসলে কী?

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তাদের সংঘবদ্ধতা ছিল পারস্পরিক সহযোগিতা ও (ঈমানী) ভ্রাতৃত্বের সংঘবদ্ধতা। তাদের সংঘবদ্ধতা হিযবী তথা দলীয় সংঘবদ্ধতা ছিল না, অথবা প্রকাশ্য বা গোপনে কোনোভাবেই উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো বিষয় ছিল না।

প্রবণতা ও চিন্তাচেতনায় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমি এই কথাটি সকল মুসলিমের উদ্দেশ্যেই উপস্থাপন করছি। বিশেষ করে সেই শ্রেণির মানুষকে লক্ষ্য করে বলছি, যারা নিজেদের জন্য কঠিক পথ বেছে নিয়েছেন। কেননা সেটাই হক্কের পথ। অন্য দিক দিয়ে, সেটা আবার সহজ পথও বটে। কেননা সেটাই শরী'আতের পথ। সেই শ্রেণির মানুষ তারাই, যারা ইলম, আমল, দাওয়াত ও জিহাদ সবক্ষেত্রেই 'কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ করেন এবং মুমিনগণের পথের অনুসরণের প্রতি আগ্রহী হন। তারা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর ছাহাবীবর্গ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এবং সালাফে ছালেহীনের মতো অনুগ্রহপ্রাপ্তগণের পথ আঁকড়ে ধরার প্রতি যত্নশীল হন'।[৪] তারা 'ইসলামী দাওয়াতকে দাওয়াতের দলীয় গণ্ডি থেকে বের করে সকল মানুষের তরে নিবেদিত করতে চান। এক্ষেত্রে তারা নির্দিষ্ট দল বা জামা'আতের আঙ্গিকে জোট গঠনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন না'।[৫]

তারা এই পথে চলতে রাত-দিন জোর দিয়ে বলে থাকেন, তাদের দাওয়াত 'আল্লাহর পথে ধাবমান প্রত্যেকের জন্যই মানহাজ ও পথ বাতলে দিতে এসেছে। নির্দিষ্ট কোনো জামা'আত বা দলের মাসলাক হওয়ার পূর্বে সেটা আসলে দ্বীন বুঝা ও তার প্রতি আমল করার একটি মানহাজ'।[৬] বরং এই দাওয়াত দলাদলি ও স্বদলপ্রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এসেছে।[৭] এসেছে সমস্ত মুসলিমের মাসলাক হিসেবে একটি স্বচ্ছ-নির্মল আক্বীদা ও একটি শারঈ মানহাজকে ঘিরে'।[৮]

এসবই ইসলামী শরী'আতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুমহান লক্ষ্য হিসেবে পরিগণিত। সেজন্যই তো 'সকল মুসলিম একটিমাত্র উম্মাহ, তাদের লক্ষ্য এক, তাদের পথ এক, তাদের সংবিধান এক। তারা সকলেই সমান। তাক্বওয়া ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে তাদের মাঝে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। রং, জাতি বা অঞ্চলভেদে তাদের কারো কোনো বিশেষত্ব নেই।

এই ব্যাপক অর্থবোধক ঐক্য ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিদর্শন এবং একটি বিরাট অবদান। এই বহুমুখী ঐক্যই ইসলাম যমীনের বুকে মানবসমাজে বাস্তবায়িত করেছে। এই সর্বব্যাপী ঐক্যের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আক্বীদা এক, পথ এক। **বিশেষ ব্যবধান ও শ্রেষ্ঠত্ব বাতিল করা।** আর তাক্বওয়া ও নেক আমলের ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা'।[৯]

আল্লাহর কসম! মুসলিমদের দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে যাওয়ার ভান ধরে দলাদলির খাদে পড়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যা। সুতরাং আপনি এখান থেকে সতর্ক থাকুন।

উপসংহার:

"মুসলিমগণ! জেনে রাখুন, আমাদের মহান রবের অন্যতম ইনছাফ হচ্ছে, তিনি জামা'আত ও দল হিসেবে মানুষদের হিসাব নিবেন না। বরং দল ও গোত্র থেকে দূরে রেখেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা আলাদা সম্বোধন করবেন। মহান

৪. আল্লামা আল-মু'আল্লিমী আল-ইয়ামানী, আত-তানকীল, ১/৪৫।

৫. মাজাল্লাতুল ফুরক্বান, সংখ্যা: ১৪, পৃ. ২০, প্রবন্ধশিরোনাম: বারাকা-তুদ দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ।

৬. মাজাল্লাতুল ফুরক্বান, সংখ্যা: ১৪, পৃ. ২০, প্রবন্ধশিরোনাম: বারাকা-তুদ দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ।

৭. 'আত-তাছফিয়াহ ওয়াত-তারবিয়াহ ওয়া আছারুহুমা ফিসতি'নাফিল হায়াতিল ইসলামিয়্যাহ' শীর্ষক আমার পুস্তিকায় এই মাসলাকের প্রকৃতি ও বাস্তবতা এবং পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

৮. মাজাল্লাতুল ফুরক্বান, সংখ্যা: ১৪, পৃ. ২০, প্রবন্ধশিরোনাম: বারাকা-তুদ দাওয়াহ আস-সালাফিয়্যাহ।

৯. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-মাকাছেদুল আম্মা লিশ-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৩১।

আল্লাহ বলেন, ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا - لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا - وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ ‘আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে পরম করুণাময়ের কাছে হাযির হবে না। তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী’ *(মারইয়াম, ১৯/৯৩-৯৫)*।

অতএব, হে মুসলিম! রাত-দিন আল্লাহর আনুগত্যের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আপনার মুসলিম ভাইদের সম্মানহানি বৈধ করে নিয়ে এবং নিজেকে তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরে মশগূল ভেবে এক দলের উপর অন্য দলকে সাহায্য করে সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন, প্রত্যেকটি মানুষকে তার প্রেরিত আমলসহ উঠানো হবে এবং অন্যের পাপের কারণে কাউকে পাকড়াও করা হবে না। মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ‘একের (পাপের) বোঝা অন্যে বহন করবে না’ *(আল-আনআম, ৬/১৬৪)*।”[১০]

‘অতএব, -আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন- আপনি মানহাজে মুস্তাক্বীম, কুরআন-সুন্নাহর বাণী এবং সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য আঁকড়ে ধরুন। আপনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের পথেই থাকুন, হেদায়াত লাভ করবেন ইনশা-আল্লাহ।

হে প্রজ্ঞাবান! কুরআন-সুন্নাহর মোড়কের ভেতরে যা আছে, তা আঁকড়ে ধরা, বেশি বেশি সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং এর অর্থ অনুধাবনের চেয়ে আপনার জন্য উত্তম আর কিছু নেই। আপনি আপনার থেকে যাবতীয় বক্রতা এবং কেন? কীভাবে? ইত্যাদি ঝেড়ে ফেলুন। কারণ খেয়াল-খুশি প্রবৃত্তিপূজারিদের বক্র পথে নিয়ে তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবে নিক্ষেপ করেছে’।[১১]

আল্লাহর বান্দা! প্রকৃত ও আল্লাহওয়ালা সচেতন মুসলিম হোন। আল্লাহর জন্যই জানুন, আল্লাহর জন্যই আমল করুন। সকল মুসলিমের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখুন। তাক্বওয়া ও ঈমান ছাড়া অন্য কিছু যেন তাদের কাউকে আপনার নিকট অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী করতে না পারে। কোনো ধরনের হিযবিয়্যাহ বা দলাদলি এবং শয়তানী বিভেদ যেন কাউকে অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী করার মানদণ্ড না হয়।

জেনে রাখুন, ‘ইসলামকে ঘিরে মুসলিমদের ঐক্য, তাদের আল্লাহর রজ্জু ধারণ, তাঁর শরী‘আতকে সালিশ হিসেবে গ্রহণ আর মুসলিমদের শত্রুদের সাথে সম্পর্কহীনতা এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও ঘৃণার স্পষ্টতাই তাদের বিজয় ও শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদের রক্ষার উপায়’।[১২]

এর বাইরে যত দলাদলি, বিভক্তি, গুপ্ত-আঁধারে ঘেরা বিষয় এবং রাজনৈতিক উত্তেজনায় বেষ্টিত বিষয় রয়েছে, সেগুলো কানাকড়িও কাজে আসবে না। বরং এগুলো ধীরে ধীরে পাকড়াও আর কঠিন অনিষ্ট ছাড়া অন্য কিছুই বয়ে আনবে না। **এটা সতর্কবার্তা!!**

‘প্রকৃত সচেতন মানুষ সব গনীমতের মাল থেকে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেন। সকল দলের নিকট বিদ্যমান ভালো দিক অনুযায়ী তিনি তাদের সাথে মেশেন। **তিনি কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করেন না।** আবার অন্যদের থেকে পুরোপুরি দূরত্ব বজায় রেখে চলেন না এই ভেবে যে, তাদের নিকট হক্কের সামান্য অংশও নেই। অতএব, এটাই হচ্ছে সত্যবাদীদের পথ।

আর অন্তরে লুক্কায়িত রয়েছে জাহেলী নিনাদ’।[১৩]

﴿أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ‘আমি তো আমার সাধ্যমতো কেবল সংশোধনই চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোনো তাওফীক্ব নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই’ *(হূদ, ১১/৮৮)*।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহুর কাছে প্রার্থনা করি, এই বইটি যেন হয় সত্যিকারের আর্তনাদ, যা খুঁজে পাবে কতিপয় মনোযোগ দিয়ে শ্রবণকারী কান এবং সচেতন কিছু হৃদয়।

আমাদের শেষ কথা হচ্ছে, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগৎসমূহের রব।

---

১০. আত-ত্বলী‘আহ, পৃ. ১৩-১৪, ঈষৎ পরিমার্জিত।

১১. মালাতী, আত-তানবীহ, পৃ. ৪৬, সংক্ষেপিত।

১২. ইবনে বায, নাক্বদুল ক্বওমিয়্যাহ আল-আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৭।

১৩. মাদারিজুস সালেকীন, ২/৩৭০।

কুরআনের আলোকে হাদীছের অপরিহার্যতা

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৩)

শরীআত প্রণয়নে হাদীছের স্বাধীন সত্তা :

আধুনিক যুগের মুনকিরে হাদীছরা সবসময় হাদীছকে কুরআনের বিরুদ্ধে পেশ করে থাকে। তারা সহজ-সরল মুসলিমদের এই বলে মগজ ধোলাই করে যে, আমরা শুধু সেই হাদীছ মানব, যা কুরআনের পক্ষে। কুরআনের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো হাদীছ আমরা মানব না। কুরআনের বিরুদ্ধে যায় এমন হাদীছ মানলে শিরক হবে। অথচ তাদের কাছে স্পষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই, যেটা দিয়ে একটি হাদীছের সাথে কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বিরোধিতা বুঝা সম্ভব। বরং তারা হাদীছ অস্বীকারের জন্য এই অজুহাতকে খুব ভালোভাবে প্রয়োগ করে থাকে। নিজের ইচ্ছামতো বুখারী-মুসলিমের অকাট্য ছহীহ হাদীছকেও কুরআন বিরোধী বলে বাতিল করে দেয়। এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে। কুরআনের বিপরীতে হাদীছকে পেশ করে কুরআনের সম্মান বাড়ানো কখনই তাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে হাদীছ অস্বীকারের অতি চালাকি রাস্তা তারা অবলম্বন করে থাকে। যা শুধু হাদীছকে অপমান করা নয়, বরং কুরআনকেও অপমান করার শামিল। নিজের সাথে ও মহান আল্লাহর সাথে ছলচাতুরী বৈ কিছুই নয়। তাদের এই ছলচাতুরী বাহানার জবাবে আমরা আজকে পবিত্র কুরআন থেকে এমন কিছু দলীল পেশ করব, যেখানে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে শরীআত প্রণয়নের স্বাধীনতা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। যা প্রমাণ করে কুরআন ও হাদীছ কখনই পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়। বরং কুরআনের মতো হাদীছও শরীআত প্রণয়নে স্বাধীন। একটার সাথে আরেকটি কখনই শর্তযুক্ত নয়। হাদীছ মানার জন্য কুরআনের অনুকূলে অথবা কুরআন মানার জন্য হাদীছের অনুকূলে হওয়ার কোনো শর্ত মহান আল্লাহ প্রদান করেননি। যেহেতু উভয়টিই শরীআত প্রণয়নে স্বাধীন, সেহেতু তাদের মধ্যে কোনো বিরোধ হওয়া অসম্ভব। যদি এই রকম কোনো শর্তের প্রয়োজন হতো, তবে মহান আল্লাহ অবশ্যই পবিত্র কুরআনে তা বলে দিতেন।

দলীল : ১

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ ‘যে রাসূলের অনুসরণ করল, সে মহান আল্লাহর অনুসরণ করল’ *(আন-নিসা, ৪/৮০)*।

ব্যাখ্যা : একদল মুনকিরে হাদীছে বলে থাকে, পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করলেই আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ হয়ে যায়। আলাদা করে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই আয়াতে স্বয়ং মহান আল্লাহ তাদের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত আদেশ প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যকেই যথেষ্ট বললেন তাঁর আনুগত্যের জন্য। তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করলে বাই ডিফল্ট মহান আল্লাহর আনুগত্য হয়ে যাবে। কেননা তাঁর রাসূল ﷺ অহীর বাইরে কিছু করেন না বা বলেন না। এখানে আল্লাহ তাআলা হাদীছ মানার জন্য কুরআনের অনুকূলে হওয়ার শর্তারোপ করা তো বহু দূরের কথা, বরং নিঃশর্তভাবে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর অনুসরণকেই আল্লাহর অনুসরণ হিসেবে গণ্য করার ঘোষণা দিয়েছেন।

দলীল : ২

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরী করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কতকের প্রতি (অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি) ঈমান আনয়ন করি এবং কতকের প্রতি (অর্থাৎ রাসূলের প্রতি) কুফরী করি আর তারা মূলত উভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করতে চায়’ *(আন-নিসা, ৪/১৫০)*।

ব্যাখ্যা : ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেও আমাদের নবীর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের উদ্দেশ্যেই মূলত মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, আনুগত্যের দিক থেকে নবীগণ স্বাধীন। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে যদি রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনা হয়, তবে সেটাও কুফরী। নবীদের হাদীছ বাদ দিয়ে শুধু কুরআন মানার দাবি মূলত দ্বীনের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনয়ন এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করার নামান্তর। হাদীছকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। আনুগত্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা কুফুরী।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ‘আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাদের কারো মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু’ *(আন-নিসা, ৪/১৫২)*। এই আয়াতে আনুগত্যের দিক থেকে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পার্থক্য না করার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীল : ৩

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ ‘আর যখন তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা এসো আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সেই দিকে এবং তাঁর রাসূলের দিকে, তখন আপনি দেখবেন মুনাফেক্বরা আপনার থেকে বিরাগভাজন হয়ে দূরে সরে যাচ্ছে’ *(আন-নিসা, ৪/৬১)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতে দুটি বিষয়ের দিকে মানুষকে আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তথা কুরআন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর রাসূলের প্রতি। মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের কথা বলার পরও তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি যারা তাঁর নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে মুনাফেক্ব বলে সম্বোধন করেছেন। উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন ছাড়াও আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে স্বাধীন সত্তা। শুধু কুরআন মানার দাবি এবং হাদীছকে এড়িয়ে চলা এক প্রকার মুনাফেক্বী।

দলীল : ৪

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের আর তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাশীল রয়েছে তাদের’ *(আন-নিসা, ৪/৬১)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ‘আতিঊ’ তথা ‘আনুগত্য করো’ আদেশ-বাচক শব্দটি আলাদা আলাদাভাবে তাঁর নিজের জন্য এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রয়োগ করেছেন। উভয়ের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ‘ওয়া’ ব্যবহার করেছেন। এই সংযোজক অব্যয় ‘ওয়া’ ভিন্নতার প্রমাণ বহন করে। পাশাপাশি উভয়ের জন্য একই শব্দ দুইবার ব্যবহার করাও আলাদা স্বাধীন সত্তার প্রমাণ বহন করে। তথা আনুগত্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাধীন সত্তা। প্রশ্নাতীতভাবে তাঁদের আনুগত্য করতে হবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের একই সাথে দুইজনের আনুগত্যের নির্দেশ পবিত্র কুরআনের আরো বহু জায়গায় করা হয়েছে। যেমন- সূরা আন-নূর, ২৪/৫৪; মুহাম্মাদ, ৪৭/৩৩ প্রভৃতি আয়াতে।

দলীল : ৫

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এবং আপনার রাসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দিন’ *(আলে ইমরান, ৩/৫৩)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের পাশাপাশি আলাদাভাবে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। যা কুরআন ছাড়াও শরীআত প্রণয়নে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বাধীন সত্তার প্রমাণ বহন করে।

দলীল : ৬

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যাকে তারা তাদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে লিখিত আকারে পায়। তিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং তাদেরকে তিনি মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র জিনিসকে হালাল করেন এবং তাদের জন্য নিকৃষ্ট জিনিসসমূহকে হারাম করেন এবং তিনি তাদের উপর থেকে সেই বোঝা ও শৃঙ্খলসমূহকে অপসারণ করেন, যা তাদের উপর আরোপিত ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাঁকে সম্মান করে, তাঁকে সহযোগিতা করে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ নূর (কুরআন) এর অনুসরণ করে, তারাই প্রকৃত সফলকাম’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৫৭)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ‘নূর’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন। এই আয়াতে কুরআনের অনুসরণের পাশাপাশি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের স্বাধীন সত্তাকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এমন নবী যিনি নিরক্ষর, যার কথা তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লেখ রয়েছে। যিনি পবিত্র জিনিসকে হালাল করার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং মন্দ জিনিসকে হারাম করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। তার স্বাধীন সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালাল ও হারামের বিধান মানাকে কুরআনের পাশাপাশি সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অনুসরণের উপর, যাকে সহযোগিতার উপর, যার সম্মান করার উপর, ভাল-

www.al-itisam.com

মন্দ কাজে যার আদেশ-নিষেধ মানার উপর মানুষের সফলতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রণীত হালাল ও হারাম মানার জন্য কুরআনের অনুকূলে হওয়ার কোনো শর্ত প্রদান করা হয়নি। বরং নিঃশর্তভাবে শরীআত প্রণয়নে নবী ﷺ-এর স্বাধীন সত্তার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপরও যারা এই পরম সত্যকে স্বীকার করতে ও তা মেনে নিতে চাইবে না, তারা মূলত হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন অনুসরণের মিথ্যা দাবি করে মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে বিপদগামী করতে চায়।

দলীল : ৭

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ‘আর এটা কোনো মুসলিম নর ও নারীর জন্য সঙ্গত নয় যে, যখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কোনো ফয়সালা দিবেন, তখন সেই বিষয়ে তাদের (ভিন্ন কিছু করার) কোনো ইখতিয়ার থাকবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে, সে নিশ্চিতরূপেই পথভ্রষ্ট হবে’ *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতটি যায়নাব বিনতে জাহশের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ যায়নাব বিনতে জাহশের জন্য যায়েদ ইবনু হারেছার বিবাহের প্রস্তাব পাঠালে, তিনি সম্ভ্রান্ত কুরায়েশ বংশীয় হওয়ায় বিষয়টিকে পছন্দ করেননি। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১]

দলীলের যৌক্তিকতা : আল্লাহর রাসূল ﷺ কর্তৃক উক্ত বিবাহের সিদ্ধান্তটি কুরআনে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। তথা এটি কুরআনের বাহিরে রাসূল ﷺ-এর হাদীছ ছিল। উক্ত আয়াতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এই হাদীছ মানা সকল মুমিন ও মুমিনার জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করা হয়েছে। যা শরীআত প্রণয়নে হাদীছের স্বাধীন সত্তার উপর প্রমাণ বহন করে।

দলীল : ৮

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ‘কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত (সত্যিকার) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী না মানে, তারপর আপনি যা ফয়সালা প্রদান করেন সেই বিষয়ে তাদের অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা না থাকে এবং তারা সেই সিদ্ধান্ত সর্বান্তকরণে মেনে নেয়’ *(আন-নিসা, ৪/৬৫)*।

ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল যুবায়ের ইবনু আওয়াম ও একজন আনছারীর সাথে পানিকেন্দ্রিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাসূল ﷺ-এর নিকটে তাদের পানির সমস্যা পেশ করা হলে তিনি যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রথমে পানি নিয়ে তারপর সেই পানি আনছারীর জমির জন্য ছেড়ে দেওয়ার আদেশ প্রদান করলেন। আনছারী ছাহাবী উক্ত সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করেন। যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ফুফাতো ভাই বলেই এমন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[২]

দলীলের যৌক্তিকতা : আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে সমাধানকল্পে যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, তা পবিত্র কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়নি। এটি কুরআনের বাইরে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল। তথা তাঁর হাদীছ ছিল। তার হাদীছের এই সিদ্ধান্ত না মানার ফলে মহান আল্লাহ এত কঠোর ও কঠিন আয়াত অবতীর্ণ করেন, যা প্রমাণ করে পবিত্র কুরআনের বাহিরেও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদীছ শরীআত প্রণয়নে স্বাধীন এবং মুমিনগণ তা মানতে বাধ্য।

এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, ইসলামী শরীআত প্রণয়নে কুরআন যেমন স্বতন্ত্র দলীল, অনুরূপভাবে হাদীছও স্বতন্ত্র দলীল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, উভয়ের উৎস আলাদা আলাদা। বস্তুত কুরআন ও হাদীছ উভয়ের উৎস একই অর্থাৎ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। রাসূল ﷺ নিজের মনগড়াভাবে কোনো কিছুই বলেননি, বরং যা কিছু বলেছেন সবই অহী; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েই বলেছেন। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন ও হাদীছের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করার কোনো অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ ‘আর না তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোনো কথা বলেন। এটা তো কেবল অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়’ *(আন-নাজম, ৫৩/৩-৪)*। সুতরাং রাসূল ﷺ এর মুখনিঃসৃত বাণী তথা হাদীছও অহীর অন্তর্ভুক্ত। অহীয়ে গায়রে মাতলূ‘ তথা ছালাতে অপঠনযোগ্য অহী আর কুরআন হলো অহীয়ে মাতলূ‘ তথা ছালাতে পঠনযোগ্য অহী। মহান আল্লাহ উভয় শ্রেণির অহীকে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন *(আল-হিজর, ১৫/৯)*।

কাজেই হাদীছ বাদ দিয়ে শুধু কুরআন মানব— এমন দাবি তোলার সুযোগ অন্তত ইসলামে নেই।

(চলবে)

১. তাফসীরে কুরতুবী, সূরা আল-আহযাব, ৩৩/৩৬-এর তাফসীর দ্র., পৃ. ৪২৩।

২. তাফসীরে ইবনু কাছীর, সূরা আন-নিসা, ৪/৬৫-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য, পৃ. ৮৮।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কারা?

মূল : আলাবী ইবনু আব্দুল কাদের আস-সাক্কাফ

অনুবাদ : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নির্বাচিত নবী ﷺ-এর উপর এবং তাঁর সঙ্গী ও তাদের অনুসারীদের উপর।

দুনিয়া-আখেরাতের মুক্তি ও সফলতা নির্ভর করে হক্কের অনুসরণ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পথে চলার উপর— এটা সবার জানা কথা। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক আক্বীদার লোকেদের মাঝে নিজেদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ দাবি করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং অনেক মানুষ এ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা বলে থাকে যে, তারাই মূলত এই উপাধির হক্বদার। পরবর্তীতে বহুকাল যাবৎ তাদের থেকে অন্যরা এ উপাধি ছিনিয়ে নিয়েছে। সুতরাং এ মূল্যবান উপাধির পরিভাষাটি কিছু বৈশিষ্ট্য এবং এর সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের কিছু বৈশিষ্ট্য মানুষের নিকট স্পষ্ট করা বিজ্ঞ আলেমদের উপর আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

তাই, এ পুস্তিকায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের এমন কিছু নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শন আলোচনা করা হবে যার মাধ্যমে মুসলিমরা প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ পরিচয় জানতে পারবে। এর ফলশ্রুতিতে মুসলিমগণ তাদের পথে চলা সহজ হবে এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের মানহাজ (পথ ও পদ্ধতি)-কে আঁকড়ে ধরে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য অন্যান্য আক্বীদা বিষয়ক লিখিত বইয়ের ন্যায় শুধু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা বর্ণনা করা নয়। বরং এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য হলো— আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ও অন্যান্য বাতিল ফেরক্বাগুলোর মাঝে পার্থক্যসমূহ এবং তাদের থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহকে পৃথককারী বৈশিষ্টগুলো বর্ণনা করা।

আস-সুন্নাহ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল ﷺ যে ইলম, আমল, আক্বীদা, চরিত্র ও পথের উপর ছিলেন তাকে সুন্নাহ বলা হয়। অর্থাৎ রাসূল ﷺ যা কিছু আমাদের নিকট নিয়ে এসেছেন তার সবই সুন্নাহ।

আল-জামাআহ দ্বারা উদ্দেশ্য : তারা রাসূল ﷺ-এর ছাহাবী এবং পরবর্তীতে যারা ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তাদের মানহাজ ও পথের অনুসারী।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ যারা তারা রাসূল ﷺ-এর অবস্থা এবং সুন্নাহ সম্পর্কে জানার প্রতি বেশি আগ্রহী হয়ে থাকেন। তারাই ছাহাবীগণের মানহাজের সাথে মিল রাখার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। শুধু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ নামে প্রসিদ্ধতা অর্জন করা, সে নাম রেখে দেওয়া বা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মানহাজের অনুসারী দাবি করা অথবা নিজের দলের নাম— সালাফী, আহলুল হাদীছ কিংবা আহলুল আছার রাখলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে বিষয়টি এমন নয়। বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহতের মানহাজকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে তার উরপ চলার নাম প্রকৃত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।

এটা একটা দাবি মাত্র যা সবাই করে থাকে। কিন্তু এ দাবি কারো ক্ষেত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ও সত্য হিসাবে স্বীকৃত হবে না যতক্ষণ না নিম্নে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ তার মাঝে পাওয়া যাবে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহই মূলত এ উপাধির প্রকৃত অধিকারী ও নিছক দাবিদারদের মাঝে পার্থক্যকারী। আমি ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথক পৃথকাকারে নিম্নে উল্লেখ করেছি, যাতে বিষয়গুলো বুঝতে, আয়ত্ত করতে এবং সামঞ্জস্য বিধান করতে সহজ হয় ইনশা-আল্লাহ তাআলা।

(১) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তাদের আক্বীদার মূল উৎস— আল্লাহর কিতাব, রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ, সালাফদের পথ এবং কুরআন ও সুন্নাহর দলীল হতে তাদের বুঝ। তারা নিজের বিবেক, আধ্যাত্মিকতা (কাশফ), নিজের পছন্দ, স্বপ্ন ইত্যাদিকে নক্বল তথা কুরআন ও সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেন না। তারা কোনো শায়খ (পীর), ওলীর বক্তব্যকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের উপর প্রাধান্য দেন না।

(২) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলের অনুসরণ করেন না। সুতরাং তারা নিজেদেরকে আশআরী, মাতুরিদী, জাহম, জা'দ, যায়েদ, উবায়েদ প্রমুখ ব্যক্তি ও দলের অনুসারী মনে করেন না। বরং তারা নিজেদেরকে সুন্নাহ এবং ছাহাবীদের (সালাফদের) অনুসারী মনে করে থাকেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর বাণী مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ 'আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর রয়েছি'।

www.al-itisam.com

(৩) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা মানহাজ এবং আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ত্বরীক্বার অনুসারী হিসাবে দাবি করেন না। সুতরাং তারা নিজেদেরকে আব্দুল ক্বাদের জিলানী, রিফাঈ, ক্বাদেরী, তিজানী প্রমুখের মুরীদ মনে করেন না। অনুরূপভাবে নক্বশাবন্দী, আলাবী, শাযেলী ইত্যাদি ত্বরীক্বার অনুসারী মনে করেন না। বরং তাদের অনুসরণ, আত্মশুদ্ধি ও আদর্শ গ্রহণের মূল উৎস হলেন, إِنَّما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ 'সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি' এ কথার কথক (অর্থাৎ রাসূল ﷺ) যার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ 'তার চরিত্র ছিল কুরআন'। দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে তারা মুসলিম উম্মাহকে যেমনভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ব্যতীত অন্য কোনো নাম দ্বারা পৃথক করেন না তদ্রূপ আত্মশুদ্ধি ও মানহাজের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ব্যতীত অন্য নামে বিশেষিত করেন না।

(৪) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা ভয়ভীতি ও একাগ্রতাসহ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করে থাকেন। তারা নিজের বা অন্য কারো পক্ষ থেকে খেয়ালখুশিমতো কোনো ইবাদত আবিষ্কার করেন না। তারা হেলেদুলে, নেচে-গেয়ে, বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে কোনো ইবাদত করেন না।

(৫) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা দু'আ, সাহায্য প্রার্থনা, প্রাণী যবেহ ও মান্নতসহ কোনো ইবাদত গায়রুল্লাহর নামে সম্পাদন করেন না। যেমনটি বর্তমান কিছু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিরোধী কিছু দল ও মতের লোকেরা করে থাকে।

(৬) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা মানুষকে কবর যিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। কেননা, তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কবরবাসীর প্রতি সালাম দেওয়া, তাদের জন্য দু'আ করার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করে, বরকত হাছিলের জন্য নয় ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট দু'আ করা বা কিছু চাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, কবরের মাটি নিয়ে শরীরে মাখার জন্য নয়, কবরের চারপাশে তাওয়াফ করার জন্য নয় অথবা কবরে পশু যবেহর উদ্দেশ্যে নয়।

(৭) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা আল্লাহর জন্য এমন সকল গুণাবলিকে সাব্যস্ত করে যা আল্লাহ স্বয়ং নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন অথবা রাসূল ﷺ তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের তা'তীল (আল্লাহর নাম ও গুণাবলিকে অস্বীকার করা) বা তা'বীল (দলীলের প্রকাশ্যরূপ হতে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা) করে না। অপর পক্ষে অন্যান্য আক্বীদায় বিশ্বাসীরা তার গুণাবলিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে অথবা কতিপয় অংশকে স্বীকার করলেও বাকী অংশর ক্ষেত্রে তা'বীল করে তাকে।

(৮) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা এই বিশ্বাস রাখে যে, কথা ও কাজের নাম ঈমান, যা কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো হ্রাস পায়। তারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সংঘটিত কার্যাবলিকে ঈমানের সংজ্ঞা হতে বের করে দেন না যেমনটি মুরজিয়া আক্বীদায় বিশ্বাসীরা করে থাকে। অনুরূপভাবে কাবীরা বা সাধারণ কোনো গুনাহের কারণেও কেবলার অনুসারীদের কাফের বলে ঘোষণা দেন না যেমনটি খারেজী আক্বীদায় বিশ্বাসীরা দিয়ে থাকেন।

(৯) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা কেবল তাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণে ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণা দেন না। তবে, মূলত কুফরী মতবাদের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে কাফের বলে ঘোষণা দিয়ে থাকেন। যেমন: ইসমাঈলিয়্যা ও নাছেরিয়্যা সম্প্রদায়।

(১০) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা সর্বদা নিজেদেরকে কাফের, মুশরিক, মুলহিদ ও মুরতাদ হওয়া হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রেখে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে থাকেন। তবে তারা মুমিনদেরকে খুব ভালোবাসে ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন এবং তাদের ঈমান ও সৎ আমলের ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতাও করে থাকেন।

(১১) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা রাসূলের ছাহাবীদের খুব ভালোবাসেন এবং এ ধারণা পোষণ করেন যে, তারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ। সকল ছাহাবী ও নবীর পরিবারবর্গকে ভালোবাসার মাধ্যমেও তারা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে থাকেন। আর যারা নবী ﷺ-এর পরিবারকে গালিগালাজ করে বা তার সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদের থেকে তারা বেঁচে থাকেন।

(১২) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা ফিক্বহের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীছ ও ইজমা দ্বারা যা প্রমাণিত তা গ্রহণ করেন। ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের কথাকেও মূল্যায়ন করেন এবং বড় বড় মুসলিম মনীষীদের কথা অনুসরণ করেন যেমন— আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুমুল্লাহ। এছাড়াও পরবর্তী সুন্নাহর অনুসারী আলেম ও ফক্বীহবৃন্দের অনুসরণ করে থাকেন। যারা মূলত সকল মানুষের কাছে উত্তম গুণে

গুণান্বিত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।

(১৩) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : শরীআতের (বিধিবিধানের) দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার দৃষ্টি সকল মুসলিম তাদের নিকট সমান। তাদের কাছে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তির মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাদের কাছে শরীআত ও হাক্বীক্বত বলতে কিছু নেই। বরং দ্বীন ও শরীআত এক রবের পক্ষ হতে অবতীর্ণকৃত একই জিনিস, যা তিনি সকল মানুষের জন্য নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ করেছেন।

(১৪) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী। যার ফলে বাড়াবাড়ি-অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, কঠোরতা ও সহজতা আরোপ করার ক্ষেত্রেও মাঝামাঝি পন্থায় অবস্থান গ্রহণ করেছে।

(১৫) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা সকল মানুষকে এক মতের অনুসারী করার মাধ্যমে একই দলে পরিচালনা করার জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী সম্প্রদায়। তাদের আক্বীদা হলো— জিহাদ প্রতিষ্ঠা করা, প্রত্যেক পুণ্যবান বা পাপী ব্যক্তির পিছনে জুম'আ ও জামাআতের ছালাত আদায় করা, বিদআতী বা পাপী ব্যক্তির পিছনে ছালাত শুদ্ধ মনে করা, যারা ঐক্য হয়ে চলে তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, যারা বিভেদ সৃষ্টি করে তাদেরকে ঘৃণা করা, যে নিজেকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করার পরেও বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করলে সুন্দরভাবে আদবের সহিত শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের পদ্ধতিতে পরিচালনা করা। আর বিভিন্ন উপাধির মাধ্যমে সম্মানের আশা করা মূলত তাদের বৈশিষ্ট্য যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

(১৬) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : যাদের মাঝে আলেম, ফক্বীহ, খত্বীব, আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধকারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, কর্মী, ধনী, ফকীর, কালো-সাদা, আরাবী-অনারাবী সব রকমের মানুষ বিদ্যমান রয়েছে। আর তাদের মানহাজ বা কার্যক্রম হলো— তারা মানুষের কোনো দলকে খাটো করবে না, সমাজের স্তরের মাঝে পৃথক করবে না। তাদের ব্যতিরেকে অন্য কোনো জাতির উপর নেতৃত্ব দেওয়াকে পছন্দ করবে না এবং তারা আল্লাহর এ কথাকে বিশ্বাস করে যে, ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলো সেই, যে আল্লাহকে বেশি ভয় করে থাকে' *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

(১৭) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তাদের মাঝে ইবাদতকারী, দুনিয়াবিমুখ, সাধারণ গুনাহগার, কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তিও বিদ্যমান রয়েছে। তবে তারা ভুল ও পাপ হতে মুক্ত নয়। আর এই ভুল ও পাপ তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হতে বের করে দেয় না। বরং তাদের দ্বারা কখনো কখনো সামান্য বিদআতও হয়ে থাকে। তবে যখনই তারা তা বিদআত হিসাবে অবগত হতে পারে তখনই দ্রুত সত্যের দিকে ফিরে আসে। সুতরাং এর কারণে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত হতে বের হয়ে যায় না।

(১৮) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ : তারা সর্বদা সত্যের অনুসরণ করে এবং সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, তারা অন্যায়কে অপছন্দ করে তবে অন্যায়কারীর সাথে বন্ধুত্ব রাখেন (অর্থাৎ পাপরে কারণে ব্যক্তিকে ঘৃণা করে না)। বিদআতকে ঘৃণা করেন তবে বিদআতীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

এরাই মূলত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত। আর এগুলো হলো তাদের কিছু আলামত বা বৈশিষ্ট্য। বিধায় আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে আমি সহযোগিতা কামনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করান এবং তাদের সাথে সকল সম্প্রদায়কেও একত্রিত হয়ে কাজ করার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন!

কিশোর গ্যাং : কারণ, ধরন ও প্রতিকার

-মো. হাসিম আলী*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিশোর গ্যাংয়ের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড :

(১) মদের টাকার জন্য দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার জাজিরা গ্রামের দশম শ্রেণি পড়ুয়া শাকিলকে খুন করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।[১]

(২) টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে গত এক সপ্তাহে কিশোর গ্যাংয়ের হামলার শিকার হয়েছে অন্তত ১৫ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী।[২]

(৩) তেজগাঁও মহিলা কলেজসংলগ্ন ১০ নং গলিতে কিশোর গ্যাংয়ের হামলার শিকার হয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে ঢাকার গভর্ণমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র আহসান হোসেন আলিফ।[৩]

(৪) সম্প্রতি মিরপুরের বাউনিয়াবাদ এলাকার শাহীন নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে কিশোর গ্যাং আশিক বাহিনীর সদস্যরা।[৪]

(৫) সম্প্রতি চট্টগ্রামে জোড়া খুনের সাথে কিশোর গ্যাংয়ের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে।[৫]

(৬) ফরিদপুরের শহরতলির ধুলদি রেলগেট বাজার এলাকায় মেমার্স মল্লিক ট্রেডার্স নামের বড় ধরনের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কিশোর গ্যাংয়ের একটি দল হামলা চালিয়ে দুজনকে কুপিয়ে জখম করে এবং ক্যাশ বাক্স থেকে ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়।[৬]

(৭) নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌরশহরে এক কলেজছাত্রীকে ইভটিজিং ও নিপীড়নের প্রতিবাদ করায় ২০-২৫ জন বখাটে রামদাসহ দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভুক্তভোগী ছাত্রীর বাড়িতে হামলা চালায়।[৭]

(৮) ঢাকার পল্লবীতে ২০২২ সালের ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি কিশোর অপরাধীদের হাতে পরপর রায়হান ও জাহিদ নামে দুই ব্যক্তি খুন হন।[৮]

(৯) নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল এলাকার আধরিয়ায় ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে চাঁদার টাকা না দেওয়ায় রাশেদ মিয়া নামে তেলের দোকানের এক কর্মচারীকে ছুরি মেরে হত্যা করে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।[৯]

(১০) ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ঢাকা উদ্যান এলাকায় বাবু নামে এক নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা।[১০]

(১১) রাজশাহীর গোদাগাড়ী সরকারি স্কুলের এসএসসি পরীক্ষার্থী সামিউল আলমকে কিশোর গ্যংয়ের সদস্যরা তুলে নিয়ে বেদম মারধর ও সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।[১১]

দৈনিক ইনকিলাবের সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সাল থেকে রাজধানীতে কিশোর অপরাধের কারণে মামলা হয়েছে প্রায় অর্ধশত। যার মধ্যে একটি মামলার বিচারকার্য চূড়ান্ত পর্যায়ে।[১২]

অঞ্চলভিত্তিক কিশোর গ্যাং :

কিশোর গ্যাং মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে শহর, নগর, গ্রাম প্রতিটি জনপদে। তবে এই গ্যাংয়ের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি রয়েছে রাজধানী ঢাকায়। ঢাকা ও এর আশপাশে শতাধিক কিশোর গ্যাংয়ের তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে।[১৩]

ঢাকার উপকণ্ঠে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় বর্তমানে ৬০টিরও বেশি কিশোর গ্যাং সক্রিয় আছে। উপজেলার গোলাকান্দাইল এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যার প্রায় সবকটিই মাদক কারবারে সম্পৃক্ত বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। এছাড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা কিশোর গ্যাংয়ের কারণে বার বার পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছে।

কিশোর গ্যাংয়ের বাহারি নাম :

কিশোর গ্যাংয়ের অধিকাংশ নামই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। এর বাইয়ের বেশ কিছু নাম আলোচনায় এসেছে। যেমন— তেজগাঁও এলাকার) 'লাল গ্রুপ', 'টক্কর ল', 'ল ঠেলা', 'মুখে

* সহকারী শিক্ষক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

১. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২২ মে, ২০২৩।
২. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ১৮ মে, ২০২৩।
৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।
৪. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।
৫. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ১২ মে, ২০২৩।
৬. দৈনিক আমাদের সময়, ৮ এপ্রিল, ২০২২।
৭. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ৬ এপ্রিল, ২০২২।
৮. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ১৫ মার্চ, ২০২২।
৯. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২২ নভেম্বর, ২০২২।
১০. দৈনিক ইনকিলাব, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২।
১১. দৈনিক যুগান্তর, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২।
১২. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ২০২৩।
১৩. দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপিল, ২০২৩।

ল' , 'পাঁয়তারা কিংস', দে ধাক্কা, লারা দে, লেভেল হাই, গুতা দে, মারা ভাণ্ডার, কালা আয়সা, ক্যাস্তা ফিরোজ ৪০ ফিট, ভাইগ্যা যা। (উত্তরা এলাকার) জিইউ, ক্যাকরা, ডিএইচবি, ব্ল্যাক রোজ, বিগ বস, পাওয়ার বয়েজ, ডিসকো বয়েজ, তালা চাবি, নাইন স্টার, নাইন এমএম বয়েজ, পোঁটলা বাবু, সুজন ফাইটার, আলতাফ জিরো, এনএনএস, ইফএইচবি, রনো, কে নাইন, ফিফটিন, থ্রি গোল, ক্যাসল বয়েজ, ভাইপার। (নারায়ণগঞ্জ এলাকায়) সেভেন স্টার, ইয়াং স্টার, টাইগার, কিং স্টার, স্ট্রয় অ্যাটাক, কসাই, বাবা, গাল কাটা লাদেন, রগকাটা আকাশ, ফ্লেক্সি সাইফ, এলকে ডেভিল. ডেঞ্জার গ্রুপ, দাদা ভাই গ্রুপ ইত্যাদি। এসব উদ্ভট নামই কিশোর গ্যাংয়ের বিকৃত মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

কিশোর গ্যাং প্রতিরোধের উপায় :

(১) নজরদারিতা : কিশোর অপরাধ বিশেষ করে কিশোর গ্যাং নির্মূলে সবার আগে প্রয়োজন নজরদারি। এক্ষেত্রে পরিবার, প্রশাসন, সমাজ, রাষ্ট্র সকলকেই সম্মিলিত ভূমিকা রাখতে হবে।

(২) পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি : পরিবার শিশুর সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে পরিবারের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াস ও উদ্যোগের বিকল্প নেই।

(৩) সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি : পরিবারের পরই সমাজের দায়বদ্ধতার বিষয়টি আসে। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের আচার-আচরণ দ্বারা শিশু-কিশোররা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সমাজের সচেতন মহল ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে সোচ্চার হলে কিশোর গ্যাং নির্মূল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

(৪) সামাজিক উদ্যোগ : কিশোর গ্যাংয়ের শক্তি ও রসদের যোগান আসে মূলত রাজনৈতিক মহল থেকে। তাই আইন বা পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে এগুলো বন্ধ করা কঠিন। সেক্ষেত্রে সমাজের ভেতর থেকেই বিপথগামী কিশোরদের সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন সাহিত্য সংঘ, সমিতি, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলাধুলার ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব স্থাপন, মানবতার দেয়াল তৈরিসহ বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে কিশোরদের অংশগ্রহণ বাড়াতে পারলে কিশোর অপরাধ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

(৫) প্যারেন্টিং প্রশিক্ষণ : প্যারেন্টিং কোনো হেলাখেলার বিষয় নয়। এটি মহান ব্রত। প্যারেন্টিং-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এদেশের অধিকাংশ পিতা-মাতাই অজ্ঞ। পিতা-মাতাকে প্যারেন্টিং প্রশিক্ষণ প্রদান কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

(৬) খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সংপৃক্ততা বৃদ্ধি : খেলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব কাজে কিশোরদের যুক্ত রাখলে অপরাধে জড়ানোর প্রবণতা হ্রাস পাবে। সুতরাং কিশোর গ্যাং প্রতিরোধে পর্যাপ্ত খেলার মাঠ ও খেলার সামগ্রীর ব্যবস্থা ও সুস্থ ধারার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা জরুরী।

(৭) বই পড়া : বই জ্ঞানের ধারক। বই জ্ঞানের ভান্ডার। বই পাঠের অভ্যাস মানুষকে দুশ্চিন্তা, অলসতা, অস্থিরতা থেকে মুক্তি দেয়। বইয়ের সাথে একবার সম্পর্ক হয়ে গেলে কিশোররা আর গ্যাং কালচারের দিকে ফিরেও তাকাবে না। সে কারণে পারিবারিকভাবে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে পর্যাপ্ত সমৃদ্ধ পারিবারিক ও পাবলিক লাইব্রেরি।

(৮) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি : কিশোর গ্যাং দমনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারির বিকল্প নেই। তাদের কার্যকর ভূমিকার মাধ্যমে কিশোর গ্যাং নির্মূল করা সম্ভব। এজন্য তাদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার স্পেস দিতে হবে।

(৯) সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ : সামাজিকীরণ বাধাগ্রস্ত হলে শিশুর বিকাশ ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। আর সঠিক ও সুষ্ঠু সামাজিকীকরণই পারে শিশু-কিশোরদের সব ধরনের অপরাধপ্রবণতার পথ রুদ্ধ করতে। তাই কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের উপর জোর দিতে হবে।

(১০) কিশোরের সংজ্ঞা ও আইন পরিবর্তন : বর্তমানে কিশোররা পরিণত মানুষের মতোই আচরণ করছে। তাদের অপরাধের ধরন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বয়স্কদেরও হার মানাচ্ছে। সে কারণে শিশু আইনের দোহাই দিয়ে কিশোর অপরাধীকে ছাড় দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রয়োজনে শিশু আইন সংশোধন আনতে হবে।

(১১) কিশোর কারাগার স্থাপন : অপরাধী কিশোরদের জন্য পৃথক কোনো কারাগারের ব্যবস্থা নেই। সে কারণে তাদেরকে প্রকৃতার্থে সংশোধন করা সম্ভব হচ্ছে না।

(১২) নৈতিক শাসন জোরদার করা : কিশোর অপরাধ নির্মূলে শুধু আইনী শাসনই যথেষ্ট নয়। আইনী শাসনের পাশাপাশি নৈতিক শাসনের মাধ্যমে কিশোরদের সুপথে ফেরানোর চেষ্টা করা প্রয়োজন। সম্প্রতি এ ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে রাজশাহী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল-২-এর বিচারক মুহা. হাসানুজ্জামান। তিনি অভিযুক্ত রাজশাহীর ২৬ শিশু আসামিকে ভালো কাজ করার শর্তে মুক্তির সুযোগ দিয়েছেন। সাজাপ্রাপ্তদের ভালো

কাজ করার এই কার্যক্রম ছয় মাস পর্যবেক্ষণ করার কথা আদেশে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, এই ছয় মাস তারা নিজ নিজ বাড়িতেই থাকবে। যদি তারা আদালতের নির্দেশনা ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের শর্ত অনুযায়ী সুন্দর জীবনযাপন করে, তাহলে তাদের মামলা থেকে খালাস দেওয়া হবে। তবে যারা নির্দেশনা উপেক্ষা করবে তাদের আবারও বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়া তাদের মাদকে না জড়ানো, বাল্যবিবাহ না করা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, মারামারিতে জড়ানো থেকে বিরত রাখতে বলেছে আদালত। এসময় তাদেরকে ভালো কাজ করাসহ সমাজসেবা দপ্তর নির্ধারিত ১০টি শর্ত মেনে চলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। এরপর ছয় মাস পর আদালত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ঘোষণা করে।[১৪]

(১৩) প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ : Prevention is better than cure অর্থাৎ 'রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম'। কোনো অপরাধের পর তার কারণ ও ধরন নিয়ে গবেষণার চেয়ে জরুরী হলো ঐ অপরাধ সংঘটনের উৎস বন্ধ করা। প্রতিরোধমূলক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে আক্রমণ ও সংক্রমণের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় থাকে। অপরাধের ক্রমবর্ধমান এই নবতর প্রবণতা রুদ্ধ করতে না পারলে এবং তা সমাজদেহে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়লে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাস্তবপক্ষেই হুমকির মুখে পড়বে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা, আরও বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা করা এবং কারণসমূহ উদ্ঘাটন করে প্রতিরোধে যথার্থ করণীয় নির্ধারণ করা।

(১৪) ইসলামী আইন বাস্তবায়ন : ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় একটি নেয়ামত। এতে রয়েছে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান। ইসলাম নির্দেশিত বিধানাবলি সামগ্রিক জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রদেহের সকল রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা চর্চার ব্যবস্থা হলে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা গেলেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে শান্তির আধারে পরিণত করা সম্ভব হবে এবং জাতি কিশোর গ্যাংয়ের মতো অভিশপ্ত অপরাধের বিষবাষ্প থেকে রক্ষা পাবে, ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সামগ্রিক জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার এবং এর মাধ্যমে আমাদেরকে ইহ ও পরকালের যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

১৪. দৈনিক দেশ রূপান্তর, ১৬ নভেম্বর, ২০২২।

"ছাদাক্বা কি শুধু আর্থিক দানে সীমাবদ্ধ?" প্রবন্ধটির বাকী অংশ

আবূ মালেক আল-আশআরী রাযিয়াল্লা-হু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এটা কার জন্য? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যে মিষ্টি ভাষায় কথা বলে, মানুষকে খাদ্য দেয় আর এমন সময় ছালাত আদায় করে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে' *(মুসানাদে আহমাদ, হা/৬৬১৫; মুসতাদরাক হাকেম, হা/১২০০)*।

আর মসজিদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছাদাক্বা অর্থাৎ বাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত যত পদক্ষেপ দেওয়া হবে, তার সবই ছাদাক্বায় শামিল হবে। যদি কোনো ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযূ করে বাসা থেকে একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপই ছাদাক্বা হবে। প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার পাপমোচন করবেন এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৯)*। এটি হলো আল্লাহ তাআলার এক বড় অনুগ্রহ। ছালাত ব্যতীত অন্য কিছু যদি তাকে বাসা থেকে বের না করে, তবে তার জন্য তিনটি সুসংবাদ রয়েছে— (ক) ছাদাক্বা, (খ) মর্যাদা বৃদ্ধি ও (গ) পাপমোচন। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অন্ধকারে মসজিদের দিকে গমনকারীদের ক্বিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ আলোর সংবাদ দাও' *(আবূ দাঊদ, হা/৫৬১)*। যে ব্যক্তি ফজর এবং মাগরিবে মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের খাবার তৈরি করে রাখেন। ফজর কিংবা মাগরিব যখনই সে যায় (তখনই তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা থাকে) *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯)*।

মোদ্দাকথা, আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নেয়ামতের তুলনায় বান্দার সমুদয় আমল খুবই নগণ্য। বান্দার আমল তাঁর নেয়ামতরাজির সামান্যতম অংশের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। একজন মুমিন তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে যত যত্নশীলই হোক না কেন এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদতে যত কৃচ্ছ্রসাধন করুক না কেন, তার বিশাল নেয়ামতের তুলনায় মোটেও তা যথেষ্ট নয়। বান্দা তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে স্রষ্টার অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার থেকে সংরক্ষণের শত চেষ্টা করেও আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না। এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের যতটুকু তাওফীক্ব ও সক্ষমতা দান করেছেন, তার সবটুকু দিয়ে আমরা তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব আর বলব, হে আল্লাহ! তোমার দয়া ব্যতীত তোমার সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমার রহমতের ভিখারী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা বিদআত

-সাখাওয়াতুল আলম চৌধুরী*

বুদ্ধপূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, ক্রিসমাস ডে, মীলাদুন্নবী এই চারটি উৎসবের ধরন একই। প্রতিটি উৎসবই পালন হয় ধর্ম প্রবর্তকদের জন্মবার্ষিকী হিসেবে। বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধের জন্মদিনকে বুদ্ধপূর্ণিমা, হিন্দুধর্মের প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে জন্মাষ্টমী, খ্রিষ্টানদের যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনকে ক্রিসমাস ডে বা বড়দিন, ঠিক একইভাবে ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কিছু মুসলিম নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইন্তেকালের অনেক বছর পরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে একটি নব্য ইবাদত উৎসব হিসাবে পালন করে আসছে, যা বিদআত। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

এসব উৎসবের উৎপত্তি :

এই চারটি জন্মদিন পালনের শুরু কখনোই কোনো ধর্মীয় প্রবর্তকেরা করেননি। এসব উৎসব শুরু হয়েছে তাঁদের মৃত্যুর শত শত বছর পরে। ইতিহাস ভালো করে চর্চা করলে আমরা এমনই তথ্য পাই। যেহেতু হাজার হাজার বছর আগে কোনো ক্যালেন্ডারই যখন সৃষ্টি হয়নি, তখন তাদের জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকীই বা কীভাবে নির্ণয় করা যায়? সুতরাং এই চারটি ধর্মীয় উৎসব মূলত পালন করা হয় অনুমানের ভিত্তিতে এবং তাদের অনুসারীদের ইচ্ছার প্রতিফলনে। কোনো ধর্মীয় গ্রন্থেই জন্মদিন নিয়ে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। সেখানে ধর্মীয় প্রবর্তকদের জন্মদিন পালন করার তো প্রশ্নই আসে না।

যদিও বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ফেরাউনের জন্মদিনের উৎসবের কথা এসেছে অস্পষ্টভাবে। যেখানে তার জন্মদিনে দরবারের সবাইকে মদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করার কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন— ওল্ড টেস্টামেন্টে এসেছে, 'তৃতীয় দিনটি ছিল ফেরাউনের জন্মদিন। ফেরাউন তার সব কর্মকর্তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করেন। ফেরাউন তার মদ পরিবেশক ও রুটি প্রস্তুতকারককে ক্ষমা করে দিলেন'।[১] অতএব, এই চারটি উৎসবেরই কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। এমনকি যীশুখ্রীষ্টের যে জন্মদিন পালন হচ্ছে, সেটা তার মৃত্যুর ৪৫০ বছর পরে সীমিতভাবে পালন করার কথা তৎকালীন পোপ স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবের বিপরীতে এই উৎসবটি সামগ্রিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

যেমন ইসলাম ধর্মে দুটি ঈদ রয়েছে। যা জাহেলী যুগের দুটি উৎসবের পরিবর্তে মুসলিমদের দেওয়া হয়েছে।[২] এটা হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত যে, ইসলামে ঈদ দুটি। অর্থাৎ উৎসব হচ্ছে দুটি। আর তাহলো ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা।

ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা বিদআত কেন?

কেন এই নব্য উৎসব পালন করা ইসলামে বৈধ নয়, বরং বিদআত, তার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন- এই জাতীয় উৎসব কারা কারা পালন করছে তা আমাদের দেখতে হবে। অর্থাৎ অন্য কোনো ধর্মে এই জাতীয় উৎসব আছে কি-না? যদি থেকে থাকে, তাহলে আমরা অনুরূপ কিছু পালন করতে পারব কি-না? যদি এই উৎসব অন্য ধর্মের লোকেরা পালন করে থাকে, তাহলে আমরাও কি একই উৎসব পালন করতে পারি? অথবা আমরা এমন কিছু পালন করছি কি-না, যা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

উপরিউক্ত বিষয় জানার জন্য আমরা সরাসরি প্রশ্ন করব কুরআনকে যে, আমরা অন্য ধর্মের অনুসরণ-অনুকরণ করতে পারি কি-না? বা আমরা বিধর্মীদের অনুসরণ করতে পারি কি-না? আল্লাহ আমাদের ইসলামে এমন কিছু পালন করার অনুমতি দিয়েছেন কি-না?

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে একটি আয়াত নাযিল করেছেন। তা হলো, ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ 'আর ইয়াহূদী ও নাছারাগণ আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন' *(আল-বাক্বারা, ২/১২০)*। অর্থাৎ তৎকালীন ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানরা রাসূল ﷺ-কে পছন্দ করতেন না এবং রাসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট হতেন না। কারণ রাসূল ﷺ তাদেরকে অনুসরণ-অনুকরণ করেননি এবং তাদের ধর্মেরও অনুসরণ করেননি। আর তারা যা চাইত, তা করা তো দূরের কথা বরং তার বিপরীত করার আদেশ দিতেন। যার প্রেক্ষিতে তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। আর এই কথাই আল্লাহ উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা মুমিনদের জানিয়ে দিলেন। আর তা এজন্যই যে, আমরাও যেন কখনো এই ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের অনুসরণ না করি।

পবিত্র কুরআনে বিধর্মীদের অনুসরণ সম্পর্কে মুসলিমদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ 'আর আপনি কাফের ও মুনাফিক্বদের

---

* পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

১. ওল্ড টেস্টামেন্ট, বুক অব জেনেসিস, ৪০/২০।

২. আবূ দাঊদ, হা/১১৩৪; নাসাঈ, হা/১৫৫৬; মুসনাদ আহমাদ, হা/১২০০৬। আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

www.al-itisam.com

অনুসরণ করবেন না' *(আল-আহযাব, ৩৩/৪৮)*। এই আয়াত দ্বারা এটা সুস্পষ্ট যে, কখনোই বিধর্মীদের অনুকরণ, অনুসরণ ইত্যাদি করা যাবে না। যদি আমরা তাদের অনুসরণ, অনুকরণ করি, তাহলে আমরা কুরআনের বিরুদ্ধে চলে যাব। *মাআযাল্লাহ মিন যালিক!*

আসুন, এবার দেখা যাক, যাকে নিয়ে এবং যার জন্মদিন পালন করাকে আমরা বড় ইবাদত তথা সকল ঈদের সেরা ঈদ বলে উল্লসিত হচ্ছি, সেই নবী মুহাম্মাদ ﷺ এই ব্যাপারে কী বলেছেন। হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে'।[৩] অর্থাৎ মুসলিমদের কেউ যদি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের অনুসরণ করে, তাহলে তাকে সেই ধর্মের অনুসারী হিসেবেই গণ্য করা হবে। অতএব, এই হাদীছের আলোকেও আমরা বিধর্মীদের অনুসরণ করতে পারি না। শুধু তাই নয়, বিধর্মীদের সামান্যতম অনুকরণও রাসূল ﷺ মেনে নেননি।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণ করতে রাসূল ﷺ কত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আর আমাদের উপমহাদেশে গত ৫০ বছর ধরে যেভাবে বিধর্মীদের অনুকরণে ঈদে মীলাদুন্নবীর উৎসবের নামে মিছিল, মিটিং, জসনে জুলূস, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির আয়োজন হচ্ছে, তা কতটুকু সমর্থনযোগ্য?

দ্বিতীয়ত, যে বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, সেটা হচ্ছে এই উৎসব করার অনুমোদন ইসলাম আমাদের দিচ্ছে কি-না। কেননা যেকোনো ইবাদত যা নেকীর উদ্দেশ্যে করা হয়, তার একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড ইসলামে রয়েছে। ইসলামে যেকোনো ইবাদত অবশ্যই রাসূল ﷺ থেকে অনুমোদিত হতে হবে। এখন এই উৎসব যা অধিকাংশ লোকই পালন করছে, তা কি রাসূল ﷺ পালন করেছেন? ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ, সালাফে ছালেহীন পালন করেছেন কি? যদি তারা পালন না করে থাকেন এবং পালন করার নির্দেশ, অনুমোদন কিছুই করে না থাকেন, তাহলে তা আমরা কীভাবে পালন করতে পারি? ইতিহাস সাক্ষী, এই মীলাদুন্নবী পালন শুরু হয়েছে ৩০০ হিজরীরও পরে। তাও একজন শাসকের তত্ত্বাবধানে। কোনো আলেম, বুজুর্গ বা কোনো আল্লাহর নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দাদের দ্বারা নয়।

সুতরাং যা অতীতে ছিল না, এখন তা যতই জৌলূস নিয়ে উদযাপন করা হোক না কেন, তা কখনই ইসলাম সমর্থিত হতে পারে না। কেননা ইসলামে নতুন কোনো আমল চালু করাই হচ্ছে বিদআত। যেই রাসূল ﷺ-এর জন্মদিন পালন করার জন্য এই উৎসব চালু করা হয়েছে, সেই রাসূল ﷺ-ই বলছেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছুর উদ্ভব ঘটাল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৪] জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হলো দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হলো ভ্রষ্টতা'।[৫] সুনানে নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে, وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ 'প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম'।[৬]

উপরিউক্ত হাদীছগুলো যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহলে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, যেসব আমল রাসূল ﷺ, ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ রহিমাহুমুল্লাহ করেননি, তা কখনোই করা যাবে না। আর কেউ করলে তা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে। শুধু তাই নয়, ইসলামে আমলের নামে নেকীর উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত তৈরি করা খুবই নিকৃষ্টতম কাজ। নতুন সকল ইবাদতই পথভ্রষ্টতা। আর সকল পথভ্রষ্টতাই হচ্ছে জাহান্নামের ইন্ধন। সুতরাং যেখানে রাসূল ﷺ নতুন ইবাদত সৃষ্টিকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেখানে আজ আমরা নিত্যনতুন রঙেঢঙে, নিত্যনতুন চাকচিক্যে, নিত্যনতুন বাহারে যে জসনে জুলূসে ইদে মীলাদুন্নবী পালন করছি, তা কতটুকু ইসলামসম্মত হতে পারে?

যারা জোড়াতালি দিয়ে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করাকে বৈধ মনে করছেন, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আপনারা বা আপনাদের পূর্ববর্তীরা কুরআনের যে আয়াত এবং হাদীছ দ্বারা মীলাদুন্নবী জায়েয সাব্যস্ত করছেন তা কি রাসূল ﷺ, ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈগণ রহিমাহুমুল্লাহ বুঝতে পারেননি? ইসলাম প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছর পর্যন্ত যা কেউ করেননি, বুঝেননি তা কি এখন আপনারা নতুন করে বুঝতে পেরেছেন? যে কুরআন রাসূল ﷺ নিয়ে এসেছেন, তিনি যে বুঝ বুঝেননি, কুরআন যাদেরকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সেসব ছাহাবীগণ যে বুঝ বুঝেননি, সে বুঝ কখনো সঠিক বুঝ হতে পারে না। কাজেই আমরা শত, হাজার বছর পর এসে যদি বুঝি যে বিধর্মীদের মতো আমাদেরও একটি উৎসব করা দরকার, তবে সেটা নেহায়েত ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কী হতে পারে?

ঈদে মীলাদুন্নবী হচ্ছে জন্মবার্ষিকী পালন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে, যে আশায় পালন করছে আমরাও তাদের মতোই করছি। অথচ জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি কোনো কিছুই পালন করার কোনো অনুমোদন বা পালন করার কোনো নযীর ইসলামে নেই।

---

৩. মুসনাদে আহমাদ, ২/৫০; আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১; আর আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। ছহীহ আল-জামে' আছ-ছাগীর, হা/৬০২৫।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮।

৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১; মিশকাত, হা/১৪১।

৬. নাসাঈ, হা/১৫৭৮, হাদীছ ছহীহ।

যদি এমন কিছু থাকত, তাহলে রাসূল ﷺ তাঁর সন্তানদের, স্ত্রীদের জন্মদিন বা জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী অবশ্যই পালন করতেন। লক্ষাধিক ছাহাবী ছিলেন, যারা রাসূল ﷺ-কে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। অথচ তারা কখনই এমনটা করলেন না, তাদের পরবর্তীতেও কেউ কিছু করল না আর আমরা ইসলামের সোনালী যুগের বহু পরে এসে নতুন করে আবিষ্কার করলাম সকল ঈদের সেরা ঈদ 'ঈদে মীলাদুন্নবী'!

ইসলামে সর্বপ্রথমে ভালোবাসতে হবে আল্লাহকে। আর আল্লাহর ভালোবাসা পেতে শর্ত হচ্ছে রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসা এবং তাঁর অনুসরণ করা। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ '(হে রাসূল!) আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলেই আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আলে ইমরান, ৩/৩১)*।

উক্ত আয়াতে কত সুন্দর করে আল্লাহ বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসা অর্জন করতে হলে অবশ্যই রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করতে হবে।

আজ আমরা যারা মীলাদুন্নবী পালন করছি, তাদের সিংহভাগই বেনামাযী। সিংহভাগ লোকই ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান রাখে না। তারা না করে কুরআন চর্চা, না করে হাদীছ অধ্যয়ন। আমাদের অধিকাংশ মুসলিমই শুধু শুনে শুনে মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করি। কষ্ট করে কখনই কিছু পাওয়ার চেষ্টা করি না। যেখানে রাসূল ﷺ এসেছেন কুরআনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, সেখানে তারা কুরআনের ধারেকাছেও নেই। আছে শুধু রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসার দোহাই দিয়ে ইসলামে বিদআতী আমল করে আশেকে রাসূল ﷺ সাজার অপচেষ্টা।

অথচ যারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসরণে রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসার নামে এমন বিদআতী কাজ করছেন, ইসলামে নতুন নতুন আমলের সৃষ্টি করছেন, তাদের জন্য হাদীছে রয়েছে রাসূল ﷺ-এর সুস্পষ্ট হুঁশিয়ারি। হাদীছে এসেছে, আবূ হাযেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)কে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি তোমাদের পূর্বেই হাউযে কাউছারের নিকট পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি সেখানে নামবে, সে পানি পান করবে আর যে ব্যক্তি সেই পানি পান করবে, সে কখনও পিপাসিত হবে না। সেখানে কিছু লোক আমার নিকট আসবে, যাদেরকে আমি চিনি আর তারাও আমাকে চেনে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করা হবে। রাসূল ﷺ বলবেন, 'তারা তো আমার অন্তর্ভুক্ত'। তখন (আমাকে) বলা হবে, 'আপনি জানেন না যে, এরা (দ্বীনের মধ্যে) আপনার পরে কী পরিবর্তন সাধন করেছে'! তখন আমি বলব, 'দুর্ভোগ তার জন্য, যে ব্যক্তি আমার পরে (দ্বীনকে) পরিবর্তন করেছে'।[৭]

উপরিউক্ত হাদীছে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে নতুন কোনো কিছু যারা তৈরি করবে, তাদেরকে রাসূল ﷺ ক্বিয়ামতের মাঠে হাউযে কাউছার থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবেন। অথচ এই হাউযে কাউছারের পানির জন্য এবং রাসূল ﷺ-এর সুপারিশের জন্য আমরা এই নব্য বিদআত ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করছি!

শুধু তাই নয় রাসূল ﷺ জানতেন যে, তাঁর উম্মত বিধর্মীদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে। তাই তিনি আগেই এই ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন। হাদীছে এসেছে, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে; বিঘতে বিঘতে এবং হাতে হাতে। এমনকি তারা যদি দ্বব (গুইসাপ সদৃশ প্রাণী) এর গর্তেও প্রবেশ করে, তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে'। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি ইয়াহূদী ও নাছারার কথা বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'তাছাড়া আর কারা?'[৮] অতএব, রাসূল ﷺ-এর কথা আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যারা বিধর্মীদের অনুসরণে-অনুকরণে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করছে, তারাও এদের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ আমাদের সর্বদা বিধর্মীদের অনুসরণ এবং আনুগত্য করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে পশ্চাতে (কুফরে) ফিরিয়ে দেবে; ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে' *(আলে ইমরান, ৩/১৪৯)*। আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের এক দলের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের অবস্থায় ফিরিয়ে দিবে' *(আলে ইমরান, ৩/১০০)*।

অর্থাৎ যারা আল্লাহর কুরআন এবং হাদীছের বিপরীতে গিয়ে বিধর্মীদের অনুসরণ-আনুগত্য করবে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো ঈমানহারা হওয়া। কেউ যদি ঈমানহারা হয়, তাহলে তার দুনিয়া এবং আখেরাত দুটিই ধ্বংস হবে। সুতরাং এমন কাজ করা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত, যে কাজের কারণে আমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাব। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন!

---

৭. ছহীহ বুখারী, হা/৭০৫০-৭০৫১।

৮. ফাতহুল বারী, ১৩/৩০০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৬৯।

www.al-itisam.com

শিরক নিয়ে অজানা কিছু কথা

-সাঈদুর রহমান*

৭০ বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অসাধ্যকে সাধন করে টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছেন। কোনো একদিন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় আগুন লেগে আপনার সব টাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বলুন তো আপনার কাছে তখন কেমন লাগবে? দুচোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা বইতে থাকবে। আপনাকে না বলেই তপ্ত অশ্রুরা আপনার গণ্ডদেশে মাখামাখি করবে। ভেতরটা ফেটে যাবে। এক পর্যায়ে আপনি গুঙিয়ে কেঁদে উঠবেন।

এমনই হলো শিরক। একটা মানুষের সারা জীবনের আমলের কাঠখড়ি শিরকের বারুদে পুড়ে সাথে সাথেই শেষ। এটার কথাই মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, ﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ ‘তোমার কাছে ও তোমার পূর্বের জাতির কাছে অহী করা হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا﴾ ‘আর তারা যা আমল করেছে, আমরা তৎপ্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*।

আমরা আমাদের যাপিত জীবনে মাঝেমধ্যে মনের অজান্তেই শিরক নামক আগুনে ঢুকে সকল আমলের কাঠখড়ি পুড়ে ফেলি। আমাদের এ বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ খবর নেই। আমরা যেন শিরক নামক এই আগুন থেকে বিরত থাকতে পারি এজন্যই আজকের লেখাটা। তাই চলুন শুরু করা যাক শিরক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা।

শিরকের সংজ্ঞা : উলূহিয়্যাত, রুবূবিয়্যাহ এবং নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শিরক বলে।

শিরকের প্রকারভেদ : শিরক দুই প্রকার। যথা— (১) বড় শিরক এবং (২) ছোট শিরক।

(১) বড় শিরক : বড় শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ ‘তোমার কাছে ও তোমার পূর্বে যারা গত হয়ে গেছে, তাদের কাছে অহী করা হয়েছে যে, যদি তুমি শিরক কর, তাহলে তোমার আমলবিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*। নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ‘যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যাতে সে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরককে বর্জন করব’।[১]

(২) ছোট শিরক : ছোট শিরক আবার দুই প্রকার। যথা— (ক) গোপন শিরক ও (খ) বাহ্যিক শিরক।

(ক) গোপন শিরক : যেমন- লোক দেখানো আমল। নবী ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ছালাত পড়ে, সে শিরক করে, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য ছিয়াম রাখে, সে শিরক করে এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান করে, সে শিরক করে’।[২] নবী ﷺ বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ ‘আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরক নিয়ে’। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, ‘রিয়া’ তথা লোক দেখানো আমল।[৩]

(খ) বাহ্যিক শিরক : কখনো কথার মাধ্যমে হয়। যেমন- নবী ﷺ বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে শিরক করল’।[৪] আবার কখনো কাজের মাধ্যমে হয়। যেমন- নবী ﷺ বলেন, مَنَ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ‘যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলাল, সে শিরক করল’।[৫]

রোগমুক্তির জন্য তাবিজ ঝুলানো জায়েয নেই। তবে শারঈ পদ্ধতিতে ঝাড়ফুঁক জায়েয আছে। ঝাড়ফুঁক করার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে।

বড় শিরক ও বড় কুফর এবং ছোট শিরক ও ছোট কুফর চেনার কিছু মূলনীতি :

(১) দলীলেই উল্লেখ থাকবে যে এটা ছোট শিরক নাকি বড় শিরক। যেমন- নবী ﷺ বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوْا : وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : الرِّيَاءُ ‘আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরক

---

* শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৮৫।
২. যঈফুত তারগীব, হা/১৯। হাদীছটি দুর্বল হলেও এর ভাব ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে যায়।
৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/২৩৬৩০।
৪. আবূ দাঊদ, হা/৩২৫১, হাদীছ ছহীহ।
৫. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৪০৪।

নিয়ে’। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শিরক কী? তিনি বললেন, ‘রিয়া’।[৬]

(২) দলীলে স্পষ্ট থাকবে এটা শিরক বা কুফর। কিন্তু অন্যান্য দলীলের আলোকে ব্যক্তিকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে কাফের বা মুশরিক সাব্যস্ত করা যাচ্ছে না, তাহলে এটা ছোট শিরক বা ছোট কুফর হবে। যেমন- নবী ﷺ বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী’।[৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ‘আমার পরে তোমরা মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পুনরায় কাফের হয়ে যেয়ো না’।[৮]

উপরিউক্ত দুটি হাদীছের মাধ্যমে বুঝা গেল যে, মুমিন ব্যক্তির সাথে লড়াই করা বা তাকে হত্যা করা কুফর। কিন্তু অপর আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এটা এমন কুফর, যা দ্বীনের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না। যেমন আল্লাহ বলেন, ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا﴾ ‘যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা উভয় দলের মাঝে আপস-মীমাংসা করে দাও’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/৯)*। এর পরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ‘মুমিনরা পরস্পর পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১০)*।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধরত মুসলিমদেরকেও পরস্পরের ভাই হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তারা যদি লড়াই করার কারণে বা মারামারির কারণে কাফের হয়ে যেত, তাহলে ভাই বলে সম্বোধন করতেন না। আরেকটা আয়াত দেখুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! হত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিছাছ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বিনিময়ে দাস ও নারীর বিনিময়ে নারী। যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করে দেওয়া হবে, সে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৮)*।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের হত্যাকারীর ভাই বলা হয়েছে। হত্যা করার কারণে যদি ব্যক্তি কাফের হয়ে যেত, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তাদের ভাই বলে উল্লেখ করতেন না। যেমন আল্লাহ বলেছেন, ﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ ‘মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু’ *(আত-তাওবা, ৯/৭১)*।

আর আল্লাহ তাআলা মুনাফিক্ব ও কাফেরদেরকে পরস্পর পরস্পরের ভাই বলেছেন, ﴿الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ ‘মুনাফিক্ব পুরুষরা ও মুনাফিক্ব নারীরা পরস্পর পরস্পরের অন্তর্ভুক্ত’ *(আত-তাওবা, ৯/৬৭)*। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ ‘তুমি কি মুনাফিক্বদের দেখনি? যখন তারা আহলে কিতাবের মধ্যে থেকে তাদের কাফের ভাইদের বলেছিল’ *(আল-হাশর, ৫৯/১১)*। হাদীছে নবী ﷺ বলেন, أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ‘কেউ তার ভাইকে কাফের বললে, তাদের দুজনের একজনের উপর তা বর্তাবে’।[৯]

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হাদীছে কাফের বলার সময় সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে সম্বোধনকারীর ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি একজন আরেকজনকে কাফের বলার কারণে দুজনের একজন কাফের হয়ে যেত, তাহলে নবী ﷺ কখনো ভাই বলতেন না’। সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম উপরের আয়াত ও হাদীছে যে কুফরীর কথা বলা হয়েছে, তা বড় কুফর নয়; বরং ছোট কুফর।

নবী ﷺ বলেন, لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ‘ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে, তখন সে মুমিন থাকে না। আর চোর যখন চুরি করে, তখন সে মুমিন থাকে না’।[১০] এই হাদীছে বলা হয়েছে, চুরি, ছিনতাই ও ব্যভিচার করার সময় তাদের ঈমান থাকে না। এর দ্বারা তারা মুশরিক হয়ে যায় এটা উদ্দেশ্য নয়। কারণ ব্যভিচার ও চুরি সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের বেত্রাঘাত ও হাত কাটা হয়। যদি হাদীছের আলোকে তারা কাফের মুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হয়ে যেত, তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। তাদের তো মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং ওই অবস্থায় তারা মুসলিম থাকে, যা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। তাই তাদের কাফের বলা যাবে না।

(৩) কুফর ও শিরক শব্দ দুটি নাকেরা (অনির্দিষ্ট) ব্যবহার করা হলে তা ছোট শিরক বা ছোট কুফর হবে। আর আলিফ লাম দ্বারা মা‘রেফা (নির্দিষ্ট) ব্যবহার করা হলে বড় শিরক বা বড় কুফর হবে।[১১] যেমন- নবী ﷺ বলেন, بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ ‘বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত ছেড়ে দেওয়া’।[১২]

(প্রবন্ধটির বাকী অংশ ২৯ নং পৃষ্ঠায়)

৬. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৩৬৩০।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৪৮।
৮. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৮৬, হাদীছ ছহীহ।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬১০৪।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮২।
১১. দ্রষ্টব্য: ইবনু তাইমিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, ১/২৩৭।
১২. আবূ দাঊদ, হা/৪৬৭৮, হাদীছ ছহীহ।

www.al-itisam.com

বাংলাদেশে সমকামিতার গতি-প্রকৃতি : ভয়াবহতা, শাস্তি ও পরিত্রাণের উপায়

-ড. মোহাম্মদ হেদায়াত উল্লাহ*

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে সমকামিতা নামক প্রকৃতবিরুদ্ধ ও নিকৃষ্ট কাজটির প্রার্দুভাব বাড়ছে। এর প্রচার-প্রসারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে হাবুডুবু খাওয়া কিছু পথভ্রষ্ট মানুষ বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরা বিভিন্ন এনজিও-এর ছত্রছায়ায় যুবকদেরকে এই অন্যায় কর্মে লিপ্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইতোমধ্যে বহু যুবক-যুবতি তাদের খপ্পরে পড়ে শুধু তাদের দ্বীনদারিতা ও চরিত্রকে ভূলুণ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং পুরো জীবনটাকেই এক গন্তব্যহীন অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। সে কারণে আমার-আপনার সন্তানসহ আমাদের যুবসমাজকে রক্ষা করতে এ বিষয়ে সচতেনতা খুবই জরুরী। বাংলাদেশে কি সমকামিতা বৈধতা পাওয়ার পথে? বর্তমানে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ৩৭৭ ধারা অনুসারে সমকামিতা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইনে বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কোনো পুরুষ, নারী বা পশু প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যৌনসংগম করে, তবে তাকে দুই বছর কারাদণ্ড দেওয়া হবে, অথবা বর্ণনা অনুযায়ী নির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে; যা ১০ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং এর সাথে নির্দিষ্ট অঙ্কের আর্থিক জরিমানাও দিতে হবে'।

৩৭৭ ধারার ব্যাখ্যায় পায়ুসঙ্গমজনিত যে কোনো যৌথ যৌন কার্যকলাপকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে, পরস্পর সম্মতিক্রমে বিপরীতকামী মুখকাম ও পায়ুমৈথুনও উক্ত আইন অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে। বাংলাদেশের বিয়ের আইনে একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, সমলৈঙ্গিক বিয়ের কোনো স্বীকৃতি বাংলাদেশের আইনে নেই। কিন্তু গত ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশে সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন Justice Makers Bangladesh বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা[১] বাতিল করে সমকামিতাকে নিরপরাধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্ট এর চিফ জাস্টিস এবং মাননীয় মন্ত্রী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর কাছে পিটিশন করেছে।[২] এখন পর্যন্ত (২১ জুন ২০২৩) এই পিটিশনে ৫০০ জনের মধ্যে ২২৮ জন স্বাক্ষর করেছে।

Justice Makers Bangladesh ও এর প্রতিষ্ঠাতা শাহানুর ইসলাম এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে সমকামিতাকে লিগ্যাল করাতে ও LGBT Agenda নিয়ে কাজ করে আসছে। এছাড়া শাহানুর ইসলাম Bangladesh Institute for Human Rights (BIHR) এর Executive director, যা প্রকাশ্যে LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) এর অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এই সংগঠনটি গত ২২ জুন ২০২৩, 'Critical Analysis of Violence against LGBTQI+ People in Bangladesh: Monitoring Online News Media in 2022' শিরোনামে একটি রিসার্চ পেপার প্রকাশ করার কথা।[৩] Report Out International ও the University of Sunderland কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'SaferToBeMe' Symposium এ এটি পাবলিশ করা হয়। সিম্পোজিয়ামটিতে সমকামীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা করা হবে মর্মে জানা যায়। উল্লেখ্য, শাহানুর ইসলামই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে ডাচ পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সমকামীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিয়ে কথা বলেছে। সে USAID এর Prosecution Manager Ges international member of Amnesty International, এছাড়াও Frontline Defenders এ তার প্রোফাইল আছে, যা মানবাধিকার কর্মীদের একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম।[৪] Frontline Defenders ও সমকামীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার। শাহানুর ইসলাম এর রিচ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হাই লেভেলের। শাহানুর ইসলাম এর সাম্প্রতিক কিছু কার্যক্রমের দিকে নযর দিলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সে কাদের ব্যাকআপে বাংলাদেশে LGBT Agenda নিয়ে কাজ করছে। ১৭ মার্চ ২০২৩, ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ কর্তৃক প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে বিশ্ব জুড়ে ১৪ জন মানবাধিকার কর্মীর জন্য একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজনে শাহানুর ইসলাম অংশগ্রহণ করে। সেখানে সে বাংলাদেশে জাতিগত, ধর্মীয় ও যৌন সংখ্যালঘুদের (সমকামী) বিরুদ্ধে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন, সমকামিতার অপরাধীকরণ বিষয়ে

---

* সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা), সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

১.https://bn.wikipedia.org/.../%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82...

২. সমকামিতা নিরপরাধিকরণ চেয়ে পিটিশন- https://twitter.com/Justice.../status/1658410661519454209...

৩. BIHR এর রিসার্চ পেপার প্রকাশ সংক্রান্ত- https://www.facebook.com/BIHR.BD/

৪. Frontline Defenders এ শাহানুর ইসলাম এর প্রোফাইল- https://www.frontlinedefenders.org/.../shahanur-islam...

ফরাসি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে তার সংগঠনকে আর্থিক, নৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং তার এজেন্ডার প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন এবং তার দলের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার দাবি জানায়। ১১ মে, ২০২৩, বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনায় ইউরোপীয় মানবাধিকার আইনজীবীদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। ইউরোপ মহাদেশের ৪৬টি রাষ্ট্রের ১০ লক্ষ আইনজীবীর প্রতিনিধিত্বকারী কাউন্সিল অব বারস এন্ড ল' সোসাইটিস অব ইউরোপ (সিসিবিই) এর মানবাধিকার কমিটি ব্রাসেলসের হোটেল রেনেসাঁসে উক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান বক্তা ছিল শাহানুর ইসলাম। সে তার বক্তব্যে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি যৌন সংখ্যালঘুদের (সমকামী) কথাও উল্লেখ করে। সিসিবিই এর মানবাধিকার কমিটির সভাপতি স্টিফেন ভন রাউমার উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে পোলান্ডের জিডান্স বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ম্যাগডালেনা উইটকাওস্কা, সিসিবিই মানবাধিকার কমিটির লিগ্যাল এডভাইজার নাথান রুজবুক, লন্ডনের এসেক্স কোর্ট চেম্বারের ব্যারিস্টার হুগ মার্সার কিউসি, দি ল সোসাইটি অফ ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস, আন্তর্জাতিক পলিসি সহকারী পেট্রা স্টোজনিক ও ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশী মানবাধিকারকর্মী কমরেড মঈনুদ্দীন খান উপস্থিত ছিলেন।

৫ জুন ২০২৩, শাহানুর ইসলাম Dunja Mijatovic এর সাথে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গে দীর্ঘ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। Dunja Mijatovic হলেন, Human Rights of the Council of Europe এর কমিশনার। এছাড়াও সে ৯ জুন ২০২৩, সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ মানবাধিকার হাই কমিশনের সদর দপ্তর উইলসন প্যালেসে তিন ঘণ্টাব্যাপী মানবাধিকার বিষয়ক সংলাপে অংশগ্রহণ করেছে।[৫] সংলাপটিতে জাতিসংঘ ও ফ্রান্সের বড় বড় মানবাধিকার কর্মী ও অ্যাম্বেসেডরসহ আরও বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। সেখানে শাহানুর ইসলাম তার বক্তব্যে বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

শাহানুর ইসলাম এর গুরু কারা তা বুঝতে আশা করি এতটুকুই যথেষ্ট হবে। আর সে এসব জায়গায় যে সমকামীদের অধিকার নিয়ে কথা বলে, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এবার, সেকশন-৩৭৭ এর আলোচনায় ফিরে আসা যাক— নেপাল ২০০৭ সালে এই আইনটি বাতিল করে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ২০১৮ সালে বাতিল করে এবং ভুটান ২০২১ সালে বাতিল করে। শ্রীলংকার এই আইনটি বাতিলের একটি বিল শ্রীলংকার পার্লামেন্টে বিচারাধীন রয়েছে এবং সম্প্রতি এটি দেশটির সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নেপাল এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মামলাগুলোর শুনানি করেছে, নেপালের আদালত সরকারকে এটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি আইন পাশ করার আহ্বান জানিয়েছে। এই আইন বাতিলের পর ভারত ও নেপাল সরাসরি সমকামী বিয়ে বৈধ করার পর্যায়ে চলে গেছে। বাংলাদেশে যদি সেকশন ৩৭৭ বাতিল করা হয়, তাহলে LGBT Movement এর পরবর্তী পদক্ষেপও এটাই হবে। এর পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে লিঙ্গ রূপান্তরের বৈধতা দেওয়া, জেন্ডার থিওরি প্রতিষ্ঠা, বাচ্চাদের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রাইড মান্থ সেলিব্রেট করা, কেন সমকামিতা-পায়ুকামিতা ভালো সেটা বুঝানো, মনে মনে নিজেকে যা মনে করব আমি ঠিক তা-ই, আমার বায়োলজিক্যাল সেক্স যাই হোক আমি যদি নিজেকে নারী মনে করি, তাহলে আমি নারীই এবং আমাকে নারী বলে স্বীকার করতে আপনি বাধ্য- এরকম বিকৃত মানসিকতা ও যৌনতার প্রচার-প্রসার। আর এগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নে অনেক আগে থেকেই আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, USAID, জাতিসংঘ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলো, UNDP, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও সমকামীদের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। পানির মতো ডলার ঢালা হচ্ছে এসব এজেন্ডার পেছনে— বছরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে পুরো পৃথিবীব্যাপী LGBT কে ছড়িয়ে দিতে, প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বৈধ করতে।

গত বছরের শেষের দিকে USAID বাংলাদেশকে ৩৫ Million Dollar দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিভিন্ন কাজের জন্য, যার মধ্যে একটা ছিল LGBT community কে

৫. শাহানুর ইসলামের ৪ সম্মেলন-
ক. ১৭ মার্চ, ২০২৩,
https://twitter.com/Justice.../status/1637457342202617857...
খ. ১১ মে, ২০২৩,
https://twitter.com/Justice.../status/1657382006416654336...
গ. ৫ জুন, ২০২৩,
https://twitter.com/Justice.../status/1665792817606676484...
ঘ. ৯ জুন, ২০২৩,
https://twitter.com/Justice.../status/1668236344429035524...

সাপোর্ট করা।[৬] ইউরোপের এম্বেসিগুলো বাংলাদেশের মাটিতে LGBT Flag উত্তোলন করছে এবং প্রাইড মান্থ সেলিব্রেট করছে। বাংলাদেশে জাতিসংঘ (United Nations–UN) এর অঙ্গসংগঠন UNDP কুখ্যাত জন মানি এর শয়তানী জেন্ডার থিওরি প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। তাদের Gender and Diversity নামে ২০১৮ সালে প্রকাশিত হেন্ডবুক এবং Gender Equality Strategy ২০২৩-২০২৬ এই দুইটা দেখলেই তাদের আসল এজেন্ডা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।[৭] আমাদের পাঠ্যবইয়ে ইতোমধ্যে ঢুকে গিয়েছে LGBT এর বয়ান। Justice Makers Bangladesh এর মতো আরও অনেকগুলো সংস্থা বাংলাদেশেই কাজ করছে সমকামিতার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার এজেন্ডা নিয়ে। দেশের প্রথম সারির বেশ কিছু ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া বারবার জন্মগত হিজড়াদেরকে Transgender (লিঙ্গরূপান্তরকারী) নামে প্রচার করছে। যেই সকল হিজড়া LGBT এজেন্ডার সাথে একমত ও সাপোর্টার, তাদেরকে দেশের বিভিন্ন বড় বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং প্রমোট করা হচ্ছে, আইকন হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে (ঢাবিতে এমফিল এ চান্স পাওয়া সঞ্জীবনী সুধা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ)। দেশের বাইরে থাকা অনেক এক্টিভিস্টরা সমকামিতাকে সমর্থন ও প্রমোট করছে (যুলকারনাইন সামি এর উদাহরণ)। সার্বিক বিবেচনায় এখন আমরা খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। বাংলাদেশে সেকশন ৩৭৭ বাতিল হয়ে গেলে LGBT এর এই ঝড়কে আর থামানো যাবে না। ত্বরিত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে পুরো দেশজুড়ে। তাই বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম, বক্তা, দাঈ, ইমাম, খত্বীব, অনলাইন এক্টিভিস্ট, ইসলামিক দল ও সংগঠন, লেখক, অভিভাবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মুসলিমদেরকে সোচ্চার হতে হবে এখনই। Justice Makers Bangladesh এবং শাহানুর ইসলামকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। সমকামিতা নিষিদ্ধ রাখার দাবির পাশাপাশি বাংলাদেশে অনলাইন-অফলাইনে সমকামিতার প্রচারের বিরুদ্ধেও আইন প্রণয়ন করার দাবি তুলতে হবে, LGBT Agenda এর ব্যাপারে অভিভাবক ও তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে। মোটকথা, LGBT এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে এখনই কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়তে হবে। যা যা করা প্রয়োজন, তা করতে হবে। মনে রাখবেন, এটা একটা মানবিক যুদ্ধ। মানবসভ্যতা ও মুসলিম উম্মাহকে বাঁচাতে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আমি জানি না, এই এজেন্ডার মতো এত বড় আঘাত মানবসভ্যতার উপর পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো এসেছে কিনা। LGBT AGENDA এর এই নীল নকশা ইবলীস নিজেই তৈরি করেছে এবং মানুষদের মধ্য থেকে তার একান্ত অনুগত শয়তানদেরকে এটি ছড়িয়ে দিতে ও প্রতিষ্ঠা করতে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে। ভারতে সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং সমকামী বিবাহকে স্বীকৃতি দিলে ভারত জুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। তাহলে মুসলিমদের কাছে আর কি অজুহাত থাকতে পারে?! আমাদের পবিত্র দ্বীন আমাদের কাছে কি এই অপবিত্র এজেন্ডার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দাবি করে না?

ইসলামে সমকামিতা (homosexuality) তথা পুরুষের সাথে পুরুষ অথবা নারীর সাথে নারীর যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কাবীরা গুনাহ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এটি যেনার থেকেও নিকৃষ্ট। কেননা তা প্রকৃতি বিরুদ্ধ যৌনাচার এবং মানবতা-বিধ্বংসী আচরণ। মানবজাতির পরিবার গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম হলো, একজন পুরুষ একজন নারীকে বৈধভাবে বিয়ে করার পর তারা দাম্পত্য জীবন গঠন করবে। অতঃপর স্বামী-স্ত্রী মধুর মিলনে স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান জন্ম দিবে। অতঃপর বাবা-মা সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিবে। এই তো হলো একটি সুন্দর মানবজীবন গঠন প্রক্রিয়া। এভাবে মানবসন্তানের বংশবিস্তার ঘটবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এই সুন্দর বসুন্ধরা। কিন্তু সমকামিতা হলো, প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও ধ্বংসাত্মক কাজ এবং মানবজাতির বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধক।

মেয়ে মানুষ সমকামী হয়? বিজ্ঞানীরা সমকামিতার প্রকৃত কারণ জানেন না, কিন্তু তারা ধারণা করেন যে, জন্মগত,

---

৬. USAID এর ৩৫ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা— https://globalbangla.tv/.../usaid-awarding-35-million-to.../

৭. UNDP Publication: (i) Geder and Diversity: https://www.undp.org/.../handbook-gender-and-diversity. (ii) Gender Equality Strategy 2023-2026: https://www.undp.org/.../publica.../gender-equality-strategy. https://twitter.com/Justice.../status/1665792817606676484.N| 9 Ryb 2023t https://twitter.com/Justice.../status/1668236344429035524...K| Geder and Diversity: https://www.undp.org/.../handbook-gender-and-diversity. L| Gender Equality Strategy 2023-2026: https://www.undp.org/.../publica.../gender-equality-strategy.

হরমোনগত এবং পরিবেশগত কারণসমূহের এক জটিল আন্তঃক্রিয়ার ফলে এটি ঘটে থাকে।[৮] তবে কিছু মানুষ স্বাভাবিক যৌন চাহিদা তথা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আর্কষণ থাকার পরও বিকৃত মানসিকতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সমকামিতায় লিপ্ত হয়।

ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করেছে যেভাবে :

ইসলাম সমকামিতার পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন— আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ‘এক পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। তেমনি এক নারী অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। দু’জন পুরুষ এক কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না। তেমনি দু’জন নারী এক কাপড়ের নিচে ঘুমাবে না’।[৯] অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ‘এক নারী অপর নারীকে স্পর্শ করবে না, যাতে সে তার স্বামীকে ঐ নারীর অঙ্গের বিবরণ এমনভাবে দিতে পারে, যেন তার স্বামী ঐ নারীকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে’।[১০] এ দুটি হাদীছে ইসলাম সমকামিতার মতো ভয়াবহ ও ঘৃণিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামিতার ভয়াবহতা :

নিঃসন্দেহে সমকামিতা ধ্বংসাত্মক ও অভিশপ্ত পাপকর্ম, আল্লাহর শাস্তির কারণ ও মানবতা বিধ্বংসী অপরাধ। নিম্নে কুরআন-সুন্নাহ ও প্রচলিত আইনের আলোকে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

(১) সমকামিতা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়ার অন্যতম একটি কারণ : লূত সম্প্রদায়ের লোকজন সমকামিতায় লিপ্ত হলে মহাশক্তিধর আল্লাহ তাদেরকে কীভাবে ধ্বংস করেছেন, তা ফুটে উঠেছে এই আয়াতে, ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ﴾ ‘অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো, তখন আমি জনপদের উপরিভাগকে নিম্নভাগে পরিণত করলাম এবং তার উপর বর্ষণ করি স্তূপীকৃত শুকনো কাদা-মাটির পাথর’ *(হূদ, ১১/৮২)*। জর্ডানে অবস্থিত ‘ডেড সি’ (The Dead Sea) বা মৃত সাগর আজও ইতিহাসে সেই ভয়াবহ ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে!

(২) সমকামিতা একটি অভিশপ্ত কর্ম : হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ثَلاَثًا ‘আল্লাহ লা‘নত করুন ঐ ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত হয়। আল্লাহ লা‘নত করুন ঐ ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি লূতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত হয়’। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।[১১]

(৩) তাছাড়া সমকামিতাকে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ প্রাণঘাতী এইডস সহ নানা জটিল ও কঠিন রোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ইসলামী আইনে সমকামিতার শাস্তি :

ইসলামের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী সমকামিতার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‘যাকে তোমরা লূত সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামিতায়) লিপ্ত দেখবে, তবে যে সমকামী ও যার সাথে সমকামে লিপ্ত হয়, উভয়কেই হত্যা করবে’।[১২] আল্লামা ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أن حكمه القتل الذي عليه أصحاب الرسول ﷺ وقد أجمعوا جميعًا على قتل اللوطي مطلقًا، سواء كان بكرًا، أو ثيبًا. بعض الفقهاء قالوا: إنه كالزاني يرجم المحصن، ويجلد البكر مائة جلدة، ويغرب عامًا، ولكنه قول ضعيف.

‘সমকামিতার শাস্তি হলো হত্যা। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবীদের সম্মিলিত অভিমত রয়েছে। তারা সকলেই একমত যে, সর্বাবস্থায় সমকামীকে হত্যা করতে হবে; চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক। কতিপয় ফক্বীহ বলেন যে, সমকামিতার শাস্তি যেনার মতোই; বিবাহিত হলে তার শাস্তি পাথর মেরে হত্যা করা হবে, আর অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর। কিন্তু এটি দুর্বল

৮. উইকিপিডিয়া।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৩৩৮; মিশকাত, হা/৩১০০।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৪০; মিশকাত, হা/৩০৯৯।
১১. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৯১৫, শায়খ শুআইব আরনাঊত হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
১২. তিরমিযী, হা/১৪৫৬, হাদীছ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৬১; মিশকাত, হা/৩৫৭৫।

অভিমত'।[১৩] অবশ্য যদি কারও সাথে জোরপূর্বক সমকামিতা করা হয় বা যার সাথে এই অন্যায় করা হয়েছে সে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা পাগল হয়, তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।

প্রচলতি আইনে সমকামিতার শাস্তি :

অধিকাংশ সমাজে এবং সরকার ব্যবস্থায় সমকামী আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে (১০ বছর থেকে শুরু করে আমরণ সশ্রম কারাদণ্ড) সহ দক্ষিণ এশিয়ার ছয়টি দেশের সংবিধানে ৩৭৭ ধারা এবং ১৯টি দেশে সমর্পযায়ের ধারা এবং সম্পূরক ধারা মোতাবেক সমকামিতা ও পশুকামিতা প্রকৃতিবিরোধী যৌনাচার হিসেবে শাস্তিযোগ্য ও দণ্ডনীয় ফৌজদারি অপরাধ। বাংলাদেশে দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা মোতাবকে পায়ুমৈথুন শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ, যার শাস্তি ১০ বছর থেকে শুরু করে আজীবন কারাদণ্ড এবং সাথে জরিমানাও হতে পারে।

কেউ যদি জন্মগতভাবে সমলিঙ্গের দিকে আর্কষণ অনুভব করে, তাহলে তার করণীয় কী?

সৃষ্টিগতভাবে কারো মধ্যে সমলিঙ্গের দিকে আর্কষণ থাকলে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাকে এমনটি করেছেন তার প্রতি পরীক্ষা হিসেবে। যেমন অনেক প্রতিবন্ধী মানবিক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কারও চোখ নাই, কারও কথা বলার ক্ষমতা নাই, কেউ বা কানে শুনে না ইত্যাদি। ঠিক তেমনি সে ব্যক্তিও নারীর প্রতি স্বাভাবিক যৌন আর্কষণবোধ থেকে বঞ্চিত। যাহোক, কোনো ব্যক্তি যদি সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আর্কষণ অনুভব করে, তাহলে এ থেকে বাঁচার জন্য তার জন্য নিম্নে আটটি করণীয় তুলে ধরা হলো :

(১) সে আল্লাহর ভয় ও জাহান্নামের শাস্তির কথা চিন্তা করে ধৈর্যধারণ করবে এবং এ জঘন্য গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কোনোভাবেই সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না। যদি সে ধৈর্যধারণ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে আখেরাতে মহাপুরস্কারে ভূষিত করবেন। আল্লাহ তাআলা বলনে, ﴿أُولَـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا - خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ 'তাঁরা যে ধৈর্যধারণ করেছেন, সেজন্য তাদেরকে প্রতিদান হিসেবে (জান্নাতে) প্রাসাদ দেওয়া হবে এবং তারা তথায় সম্ভাষণ ও সালাম প্রাপ্ত হবেন। তথায় তারা চিরকাল থাকবেন। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত সুন্দর!' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৪-৭৫)*।

(২) সর্বদা আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখবে। মনে রাখা দরকার যে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্বিয়ামতের মাঠে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমরা যত অন্যায় ও পাপকর্ম করেছি, সবকিছুই প্রকাশিত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত, সে ব্যাপারে' *(আন-নূর, ২৪/২৪)*।

(৩) যদি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মোটেই আকর্ষণবোধ না থাকার কারণে বিয়ে করা সম্ভব না হয় অথচ প্রচণ্ড যৌনবাসনা অনুভব করে, তাহলে করণীয় হলো, ছিয়াম রাখা। কেননা ছিয়ামের মাধ্যমে যৌনবাসনা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

(৪) কখনো একাকী নিভৃতে না থাকা। কেননা একাকিত্ব যৌনচিন্তা জাগ্রত করে; বরং যে কোনো দ্বীন বা দুনিয়ার উপকারী কাজে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করতে হবে। যেমন: নেক আমল করা, কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআনের তাফসীর পড়া, কুরআন মুখস্থ করা, যিকির করা, ছালাত পড়া, ইসলামী বই পড়া, ভালো আলেমদের লেকচার শোনা, শিক্ষণীয় ও উপকারী কোনো কোর্স করা, জনকল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দেওয়া, শখের কাজ করা (যদি তা হারাম না হয়) ইত্যাদি।

(৫) পাপিষ্ঠ ও খারাপ লোকদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। কারণ মানুষ সঙ্গদোষে অন্যায় ও অশ্লীল পথে পা বাড়ায়।

(৬) যৌন উদ্দীপক মুভি, মিউজিক ভিডিও, গান, টিভি শো ইত্যাদি না দেখা এবং অশ্লীল গল্প-উপন্যাস না পড়া।

(৭) যৌনবাসনাকে উদ্দীপ্ত করে এমন খাওয়া-দাওয়াও সীমিত করা দরকার। কেননা এসব খাদ্যের প্রভাবে শরীরে যৌন চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(৮) তারপরও মনে খারাপ চিন্তা জাগ্রত হলে তৎক্ষণাৎ শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা তথা *আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রজীম* পাঠ করা কর্তব্য।

(৯) সর্বোপরি মহান আল্লাহর নিকট নিজের সমস্যা থেকে মুক্তি চেয়ে দু'আ ও আরাধনা করা।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সকল প্রকার পাপাচার ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

১৩. শায়খের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।

কিতাবুল ঈমান (২য় পর্ব)

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী- ২৯তম পর্ব)

ঈমানের ফযীলত :

পবিত্র কুরআনে মোট ৫১ জায়গায় ঈমান আনয়ন এবং সৎআমল মর্মে আয়াত এসেছে। যার প্রায় অধিকাংশ জায়গায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে ঈমান আনয়নের ফযীলত ও উপকারিতা বর্ণনা করা হলো—

(১) জান্নাত লাভ : জান্নাত লাভের সবচেয়ে বড় চাবি-কাঠি ঈমান। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ‘আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত’ *(আল-বাক্বারা, ২/২৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ‘আর যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে’ *(আল-বাক্বারা, ২/৮২)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আপ্যায়নের নিমিত্তে তাদের জন্য থাকবে জান্নাতুল ফেরদাউস, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে; সেখান থেকে তারা স্থানান্তরিত হতে চাইবে না’ *(আল-কাহফ, ১৮/১০৭-১০৮)*।

এরকম অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও সৎআমলের জন্য সরাসরি জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন।

সকল সৎআমলের ভিত্তি ঈমান : আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের প্রায় ৮৯ জায়গায় যত আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন, তা ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রদান করেছেন এবং ঈমানদারগণকে আহ্বান করে প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ‘হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি, তা হতে তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭২)*।

এরকম ৮৯ জায়গায় মহান আল্লাহ ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন। যা মহান আল্লাহর নিকটে ঈমানদারদের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য যথেষ্ট।

(২) সকল বিপদ থেকে মুক্তি : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য (মুক্তির) পথ তৈরি করে দিবেন এবং তাকে এমন (উৎস) থেকে রিযিক্ব দেবেন, যেখান থেকে (রিযিক্ব প্রাপ্তি) সে আশা করে না’ *(আত-তালাক, ৬৫/২-৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ‘আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেবেন’ *(আত-তালাক, ৬৫/৪)*।

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান দুটিকে সমার্থবোধক হিসেবেই পেশ করেছেন। যা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

(৩) পাপ মোচন : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আমরা অবশ্যই তাদের থেকে তাদের পাপ মোচন করে দেব এবং তারা যা আমল করত, সেজন্য আমরা অবশ্যই তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেব’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৭)*।

(৪) শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যারা ঈমান আনয়ন করে, তাদের থেকে (শত্রুদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, অনিষ্টসাধনের অভিলাষ প্রভৃতি) প্রতিহত করেন’ *(আল-হজ্জ, ২২/৩৮)*।

(৫) বরকতময় জীবন : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ‘নর অথবা নারীর মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে, আমরা অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা আমল করত, সেজন্য আমরা অবশ্যই তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দেব’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*।

(৬) প্রকৃত সফলতা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ‘যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে তারা খরচ করে। আর যারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করে এবং পরকালের ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। তারা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে হেদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম’ *(আল-বাক্বারা, ২/৩-৫)*।

* ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বি. এ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

(৭) সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ উন্নীত করবেন’ *(আল-মুজাদালাহ, ৫৮/১১)*।

(৮) প্রকৃত নেকী : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ ‘এটা পুণ্য নয় যে, তোমরা (ছালাতে) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরাবে; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, (আসমানী) কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করলে’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৭৭)*।

(৯) উত্তম ও অধমের মধ্যে পার্থক্য ঈমান : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ - ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ ‘আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাকে (মানুষের মাঝে কতেককে) নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছি। তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তারা ব্যতীত, অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান’ *(আত্ব-ত্বীন, ৯৫/৪-৬)*।

(১০) আল্লাহর ক্ষমা : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ‘যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎআমল করেছে, মহান আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯)*।

(১১) প্রশস্ত রিযিক্ব : মহান আল্লাহ বলেন, ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ‘আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎআমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক্ব’ *(আল-হাজ্জ, ২২/৫০)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ‘আর যদি নগরবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তবে আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ খুলে দিতাম’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/৯৬)*।

(১২) ক্ষতি থেকে মুক্তি : আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ ‘সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনয়ন করে, সৎআমল করে, পরস্পরকে সৎকাজের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে সবরের উপদেশ দেয়’ *(আল-আছর, ১০৩/১-৩)*।

(চলবে)

“শিরক নিয়ে অজানা কিছু কথা” প্রবন্ধটির বাকী অংশ

উপরিউক্ত হাদীছে যে কুফর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা মা‘রেফা (নির্দিষ্ট) ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এই কুফর দ্বারা বড় কুফর উদ্দেশ্য।

(৪) ব্যক্তির বিশ্বাস, নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের কারণে কখনো কখনো ছোট শিরক ও ছোট কুফর বড় শিরক ও বড় কুফর হবে। যেমন- কেউ তাবিজ ব্যবহার করে এবং সে বিশ্বাস করে যে তাবিজের প্রভাবেই সে ভালো হয়েছে তাহলে এটা বড় শিরক হবে। আর কেউ যদি এই বিশ্বাস করে যে তাবিজ একটি মাধ্যম মাত্র। আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে ভালো করেন, তাহলে এটা ছোট শিরক হবে। এমনিভাবে কেউ যদি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা বেশি আস্থাপূর্ণ, তাহলে এটা বড় শিরক হবে। আর যদি এমন মনে না করে তবে ছোট শিরক হবে।

ছোট শিরক ও বড় শিরকের মাঝে পার্থক্য :

(১) বড় শিরক করলে ওই ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফের মুশরিক হয়ে যায়। কিন্তু ছোট শিরক করলে কাফের ও মুশরিক হয় না।

(২) বড় শিরক করলে তওবা ছাড়া এ পাপ ক্ষমা হয় না। কিন্তু ছোট শিরক করলে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের সৎ আমলের মাধ্যমে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

(৩) বড় শিরক করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকতে হবে। কিন্তু ছোট শিরক করলে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে না; বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

(৪) বড় শিরক করলে যাপিত জীবনের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ছোট শিরক করলে শুধু ওই আমলটাই নষ্ট হবে, যেটাতে শিরক পাওয়া গেছে।

(৫) বড় শিরক করলে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে তার জানমালের নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ছোট শিরক করলে পূর্ণ নিরাপত্তা থাকে।

ইসলাম প্রচারে তারুণ্যের অবদান

-মাযহারুল ইসলাম*

তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, নব উদ্দীপনা, কণ্টকাকীর্ণ পথে চলার দুঃসাহস আর সফলতা ছিনিয়ে আনার ইতিহাস কিন্তু নতুন নয়। ধোঁয়াশা পথ, প্রতিকূল পরিবেশে চলার মতো অসীম সাহস আর দুর্বার গতিও একালের লিখিত নতুন ইতিহাস নয়। তারুণ্য নিয়ে আসে জীবনের জয়গান, তারুণ্য সফলতার পথকে করে উন্মোচিত। তাদের হাত ধরে বিজয়ের বীরত্বগাঁথা রচিত হয়। তারুণ্য নিশান উড়িয়ে দেয় নব উচ্ছ্বাসের। ইতিহাস সাক্ষী! তারুণ্যের দীপ্ততা, বীরত্বগাঁথায় বিজয়ের কেতন ওড়ে মিনারের চূড়ায়। ভালোবাসা, পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে ঈমানের ভিত্তি করে সুদৃঢ়, শিক্ষা দেয় জীবনের আসল সোপান, রচিত হয় স্বর্ণালি ইতিহাস। তারুণ্য! তারুণ্য! তারুণ্য! কঠিন মুহূর্তেও নিজের শেষ সম্বল পানি নিজে না পান করে যে দিয়ে দিতে পারে অন্য পিপাসার্ত ভাইকে সেটাই তো তারুণ্য। তারুণ্য হলো বিজয়ের মত্ত আশায় সমাজে ইনছাফ ক্বায়েম করার লক্ষ্যে নববধূকে বাসরঘরে রেখে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম। তারুণ্য মানে মুহাম্মাদ ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ। তারুণ্য মানে মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহিমাহুল্লাহ। তারুণ্য মানে তারেক বিন যিয়াদ রহিমাহুল্লাহ। জীবনের উচ্ছ্বাসে তারুণ্যের সফলতা সর্বযুগেই কাম্য। অশ্লীল, বেহায়াপনাকে বিসর্জন দিয়ে আবারো সমাজ হবে পাপমুক্ত। ইনছাফ, সাম্য-মৈত্রী জাগ্রত হবে সেখানে। তারুণ্য মানেই যুলুম, অন্যায়, অত্যাচারের পিঠে কশাঘাত করে চিরতরে নিরুদ্দেশ করা। তারুণ্য মানেই সকল মতবাদ, ইজম, মত ও পথের ঊর্ধ্বে ইসলামকে বিজয়ী করা, এর প্রচার-প্রসারে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা। তারুণ্য মানে ইসলামের সুমহান আদর্শকে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তপ্ত লহু ও বাহুর শক্তিবলে অযুত কোটি ঝড়ঝঞ্ঝা আর বাতিলপন্থির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হক্ব ও আল্লাহর দ্বীন ক্বায়েমের জন্য সামনে এগিয়ে চলাই মূলত তারুণ্যের অঙ্গীকার। এজন্য বলা হয়, Youth is called the golden season of life বা 'যৌবনকে জীবনের সোনালী সময় বলা হয়'। তারুণ্যের সময় হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহ তাআলা এজন্য বলেছেন, ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ 'তোমরা যেসব অনুগ্রহ ভোগ কর, তা তো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্তু যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর' *(আন-নাহল, ১৬/৫৩)*।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীছে অসংখ্য জায়গায় যৌবনকালের উচ্ছলতা, উদ্দীপনা ও সময়ের যথার্থ মূল্যায়নের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'পাঁচটি অবস্থার পূর্বে পাঁচটি অবস্থার মূল্যায়ন করবে— (১) তোমার বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনকে, (২) অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে, (৩) দরিদ্রতার পূর্বে সচ্ছলতাকে, (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে'।[১]

তারুণ্যের এই অপরাজেয় বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বী বাহুর দুর্বার শক্তি আর সামনে অগ্রসর হওয়ার যে প্রবল উদ্দীপনা, তা তারুণ্যের জীবনকে আরো বেশি শাণিত করবে এবং চেতনার বাতিঘরে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে বীরশ্রেষ্ঠ জাতির আদর্শ সন্তান তুল্য ছাহাবীগণ।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তান এক পাও নড়াতে পারবে না— (১) সে তার জীবনকালকে কোন পথে অতিবাহিত করেছে, (২) যৌবনকাল কোথায় কাটিয়েছে, (৩) ধনসম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে, (৪) কোন পথে তা ব্যয় করেছে এবং (৫) দ্বীনের কতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না?'[২]

লক্ষ্য করুন, হাদীছটিতে গোটা জীবনের অংশকে দুটি প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। একটি প্রশ্ন করা হয়েছে গোটা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমভাবে। আরেকটি করা হয়েছে খাছভাবে শুধু যৌবনকাল সম্পর্কে।

জীবনের এই সোনালী সময় কত দামী তা হাদীছের ভাষ্যই প্রমাণ করে। মালেক ইবনু দীনার রহিমাহুল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْخَيْرُ فِي الشَّبَابِ 'কল্যাণ কেবল যৌবনকালেই বিদ্যমান'।[৩] হাসান

১. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৩৫৫; মিশকাত, হা/৫১৭৪।
২. তিরমিযী, হা/২৪১৬, হাসান; মিশকাত, হা/৫১৯৭।
৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া, ২/৩৭৩।

* অধ্যয়নরত, দাওরায়ে হাদীছ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

www.al-itisam.com

বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، إِيَّاكُمْ وَالتَّسْوِيفَ.. سَوْفَ أَفْعَلُ، سَوْفَ أَفْعَلُ‘হে যুবক সম্প্রদায়! তোমরা বিরত থাকো দীর্ঘসূত্রিতা থেকে তথা আমি খুব শীঘ্রই করব, অচিরেই করব বলা থেকে’।[৪]

তাই তো আধুনিক যুগের কবি আরবী সাহিত্যের সম্রাট আহমাদ শাওকী তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা ও তাদের জন্য নিকট ভবিষ্যতে সোনালী দিনের এক নবপ্রভাতের সূচনার মানসে কবিতায় আহ্বান করেছেন এভাবে—

عصرُكم حُرٌّ ومُستقبَلُكم في يمينِ اللهِ خيرِ الأُمَناءْ
لا تقولوا حطَّنا الدهرُ فما هو إلا من خيالِ الشعراءْ
هل علِمتُم أُمَّةً في جهلِها ظهرَت في المَجدِ حسناءَ الرِّداءْ
باطنُ الأُمَّةِ من ظاهرِها إنما السائلُ مِن لونِ الإناءْ
فخُذوا العلمَ على أعلامه واطلبوا الحكمةَ عندَ الحكماءْ
واقرءوا تاريخَكم واحتفِظوا بفصيحٍ جاءكم من فُصَحاءْ
أنزلَ اللهُ على ألسُنِهم وَحيَه في أعصُرِ الوحي الوِضاءْ
واحكموا الدنيا بسلطانٍ فما خُلِقَت نَضرتُها للضعفاءْ
واطلبوا المَجدَ على الأرض فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماءْ

অর্থাৎ হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের যুগ স্বাধীন, আর তোমাদের ভবিষ্যৎ মহান আল্লাহর ডান হাতে। তোমরা একথা বলো না যে, যুগ আমাদের পিছিয়ে রেখেছে, কেননা এটা কবিদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। তোমরা কি সেই জাতি সম্পর্কে জানতে পেরেছ, যারা অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত আছে, অথচ তাদের মর্যাদা ও স্থায়ী সভ্যতা বহিঃপ্রকাশ ঘটছে? অতএব তোমরা আলেমদের (জ্ঞানী) নিকট থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করো এবং বিজ্ঞজনদের কাছ থেকে প্রজ্ঞা অর্জন করো। তোমরা তোমাদের ইতিহাস পড়ো এবং তা প্রাঞ্জল ভাষার মাধ্যমে হেফাযত করো এমনভাবে যেন ভাষা তোমাদের কাছে প্রাঞ্জল ভাষাভাষীদের কাছ থেকে এসেছে। তোমরা ক্ষমতার সাথে পৃথিবীকে শাসন করো, কেননা দুর্বলদের জন্য কোনো প্রকার বিজয় সৃষ্টি করা হয়নি। তোমরা পৃথিবীতে মর্যাদা তালাশ করো, আর তা তালাশ করার নেশায় পৃথিবী সংকুচিত হয়ে পড়লে আকাশে তা অন্বেষণ করো।

বাংলার কবি আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪ খ্রি.) তাই দীপ্ত কণ্ঠে তার ‘জয়যাত্রা’ কবিতায় বলেছেন—

যাত্রা তব শুরু হোক হে নবীন, কর হানি দ্বারে
নবযুগ ডাকিছে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি, ভবিষ্যৎ রহে প্রতীক্ষায়
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়।
সুপ্তি ত্যাজি বরি লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক শাশ্বত কল্যাণ।

শুধু তাই নয়, একই সুরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও বলেছেন—

আমি যে চির অজেয়
ঝুটা কানুনের নিগড় আমাকে করিতে পারেনি জয়
কত নমরুদ, কত ফেরাউন, কত শাদ্দাদ ও কারুণ
আসিয়াছে মোর এই চলাপথে হইয়া বাধা দারুণ
পুড়ি নাই আমি নমরুদী হুতাশনে
বিকাইনি আমি বিপুল কারুণী ধনে
শাদ্দাদের ঐ অহংকারী মাথা বালুতে মিশেছে শেষে
ফেরাউন গেছে নীল দরিয়ায় ভেসে
নমরুদ শিরে পড়েছে পয়যার
আমি মুসলিম
এক আল্লাহ ছাড়া করি না কারো তাসলীম

তারুণ্যের এই শক্তিমত্তাই মূলত জীবনের মূল প্রেরণা। যাদের শির কখনও বাতিল শক্তির কাছে মাথা নোয়াবার নয়। ঘুনে ধরা সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার মূল কারিগর হলো তারুণ্য। ত্যাগ-তীতিক্ষা এমনকি জানমালের পরোয়া না করে হক্কের পতাকা চির উড্ডীন করার জন্য তাদের অবদান অসামান্য। সেই ফেরাউনী শক্তি হোক কিংবা আজকের ফেরাউনী শক্তি, কোনো শক্তিকে তারা তোয়াক্কা করে না। বাতিলের সাথে আপসহীনভাবে চলার অপর নাম তারুণ্য। জীবনের জয়গান মূলত তারুণ্যের জন্যই উপযুক্ত।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম যুবক তথাকথিত রাজনীতির চোরাবালিতে পড়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করছে এবং চরিত্র নষ্টকারী মাদকদ্রব্য ও নারীর খপ্পরে আটকা পড়ে সীমাহীন ক্ষতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম। আবার ঈমান, আমল নষ্ট করার পিছনে তো লেগেই আছে ধর্মীয় যত কুসংস্কার, অজ্ঞতা আর শিরক-বিদআতের বিষাক্ত ছোবল। ফলে একজন মুসলিম যুবক যেমনভাবে ধর্মীয় বেড়াজালে গোমরাহির শিকার, ঠিক ধর্মের বাইরেও নানা কুফরী মতবাদ, ইজমের সাথে আপস করে এগিয়ে যাচ্ছে জাহান্নামের কিনারে। তাই এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে প্রয়োজন মুছ‘আব বিন উমায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা। বাতিলের গায়ে তীব্র আঘাত হেনে ইসলামের স্বার্থে ঘর, বাড়ি, পরিবারের মায়া বিসর্জন

৪. ক্বিছরুল আমল, পৃ. ১৪২।

দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার এক চির আপসহীন তারুণ্যের ভূমিকা ও অবদান। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীতে যত বড় বড় অর্জন হয়েছে, তার অধিকাংশ ইতিহাস জুড়েই তারুণ্যের অবদান, আপসহীন বিপ্লব দিয়েই অর্জিত হয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম একবার সিরাজগঞ্জে মুসলিম যুবসমাজের অনুরোধে তাদের অনুষ্ঠানে তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে, যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায় সে হয়তো তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও নাওয়াকিফ।

ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীতে যে কোনো আদর্শ কিংবা থিউরি প্রতিষ্ঠার নায়ক সর্বযুগে যুবকরাই ছিল। দেশ ও জাতির উন্নতি, অবনতি তাদের উপর নির্ভর করে। তারা চাইলে দেশকে সম্মিলিত শক্তির জোরে উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে আবার তারা চাইলে উন্নত দেশকে পৃথিবীর মানুষের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত পর্যায়েও নিয়ে যেতে পারে। আমরা দেখেছি তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনা আর ফেরাউনী, নমরূদী অপশক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের উন্মুক্ত তরবারির ঝলকানি। দেখেছি পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত তাঁদের দাপট, ক্ষমতা। দেখেছি অপরাজেয় শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শী ও বিচক্ষণ সফল নেতৃত্ব। অবরুদ্ধ সমাজের অগ্রযাত্রাকে তারুণ্যের অপরাজেয় শক্তির জোরে গতিশীল এক সমাজব্যবস্থার নতুন মাত্রা যোগ করবে। তাই এমন দায়িত্ববোধসম্পন্ন জাতির বিবেক সমতুল্য যুবকদের উদ্দেশ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম চমৎকার বলেছেন তার ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ কবিতায়—

দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!
দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।
...
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি, নিয়াছ যে মহাভার।

ইসলাম প্রচারে তারুণ্যের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। ইসলামবিদ্বেষী অপশক্তির ভিতকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে তারুণ্যের পদধ্বনি। তারা জানে নির্ঘাত সম্মুখে মৃত্যু তবুও ঝাঁপিয়ে পড়েছে মৃত্যুর মুখে শুধু ইসলামের জন্য। সবার জানা মু'আয ও মুয়াওবিয রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর কথা। আবূ জাহলকে ধরাশায়ী করার সেই সাহসী ইতিহাস। আবূ জাহলকে সর্বশেষ শিরশ্ছেদ করেছিল কিন্তু তারুণ্যের দুর্বার সাহস। তারুণ্যের কত তেজ আর কী জাযবা হতে পারে তা অচিন্তনীয়। কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল, স্পেন, বাগদাদ, ফ্রান্স ইত্যাদি সর্বত্র যুবকদের দ্বারাই মহাবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। পৃথিবীর হাজার বছরের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তারুণ্যের এই অপরাজেয় হিম্মত ছিল বলেই তারেক বিন যিয়াদ রহিমাহুল্লাহ স্পেন, পর্তুগাল বিজয় করে ফ্রান্স বিজয়ের নিকটবর্তী হন। তারুণ্যের এই প্রেরণায় ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহিমাহুল্লাহ বায়তুল মাক্বদিসকে খ্রিষ্টানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয় করেন মুসলিম ইতিহাস ঐতিহ্য বিজড়িত মর্যাদাপূর্ণ এই মসজিদ। মুহাম্মাদ বিন কাসিম, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজীসহ সকলেই তারুণ্যের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যৌবনকাল বিলিয়ে দিয়েছেন দেশ ও জাতি গঠনের কাজে। এই অকুতোভয় বীর সেনাদের বীরত্বগাঁধা জাতি আজীবন মনে রাখবে।

তারুণ্যের অমূল্য সম্পদ, জানমাল বিসর্জনের ফলে ইসলামের অগ্রযাত্রা কোনো যুগেই স্তিমিত হয়নি। তারুণ্যের পদধ্বনি ইসলাম প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছে। তাদের বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে ইসলাম আজ পৃথিবীর বুকে সমুন্নত। তাই আজকের ইসলামবিদ্বেষীদের নানামুখী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য একনিষ্ঠ কর্মঠ যুবসমাজ প্রয়োজন। যারা তাদের জানমাল বিসর্জন দিবে ইসলাম প্রচারের জন্য। যাবতীয় কুফরী মতবাদ আর নোংরা রাজনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও শিক্ষা ধারণ করে দেখিয়ে দিবে ইসলাম মানুষের স্বভাব ও মানবতার ধর্ম।

আমরা সেই প্রত্যাশাই করি আজকের তরুণসমাজের কাছে। পরিশেষে কবি ফররুখ আহমদের ‘সাত সাগরের মাঝি’ কবিতার কয়েকটি লাইন স্মরণ করিয়ে বিবেককে পুনরায় জাগ্রত করার আহ্বান রইল তরুণ প্রজন্মের কাছে—

দেখ জমা হল লালা রায়হান তোমার দিগন্তরে;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে!
তোমার জাহাজ হয়েছে কি বানচাল,
মেঘ কি তোমার সেতারা করে আড়াল?
...
উচ্ছৃঙ্খল রাত্রির আজো মেটেনি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে। তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?

www.al-itisam.com

মাদকদ্রব্যের কুফল ও তার প্রতিরোধে করণীয়

[২৬ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪৪ হি. মোতাবেক ১৪ জুলাই, ২০২৩ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন ***শায়খ ড. ছালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হুমাইদ*** *হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত পিএইচডি গবেষক* ***আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ।*** *খুৎবাটি* ***'মাসিক আল-ইতিছাম'****-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]*

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর মনোনীত সম্মানিত নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবীদের উপর দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মানুষ সকল! আমি আপনাদেরকে ও নিজেকে আল্লাহভীতির অছিয়ত করছি। অতএব আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করবেন। আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলে এমন ব্যক্তির সান্নিধ্য গ্রহণ করুন ও চিন্তাশীল ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন। আপনারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করুন, সৎ ব্যক্তিদের মধ্য হতে বন্ধু গ্রহণ করুন এবং শত্রুর প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করুন। আপনারা বিবেককে সংবরণ করুন এবং আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনারা কখনোই কাউকে কষ্ট দিবেন না। আল্লাহ তাআলার ভাষায়, ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ 'আর তোমরা লোকের সাথে উত্তমভাবে কথা বলবে' *(আল-বাক্বারা, ২/৮৩)*। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। খুব শীঘ্রই আপনারা প্রস্থান করবেন আর তখন শুধু আপনাদের কথা ও পদচিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব' *(আন-নাহল, ১৬/৯৭)*।

হে মুসলিমগণ! সেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে সুগঠিত করেছেন। তাদেরকে ঈমান দ্বারা সুসজ্জিত ও আলোকিত করেছেন। তাদেরকে আক্বল বা বিবেক দান করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর তাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করেছেন। হে আল্লাহর বান্দা! আক্বল বা বিবেক হলো দায়িত্ববোধের চাকতিস্বরূপ। বিবেকের অবর্তমানে ব্যক্তির উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ রহিত হয়ে যায়। আর আক্বল বা বিবেককে এই নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, বিবেক ব্যক্তিকে প্রবৃত্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে সজাগ করে এবং অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বাধা দেয়।

আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাযত করুন। বিবেক হচ্ছে মানুষের মানবিকতার মূল ভিত্তি। তার স্বভাব-প্রকৃতির প্রধান উপাদান ও তার দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার মূল হেতু। এই আক্বল বা বিবেকের দ্বারাই মানুষ চিন্তা ও উপলব্ধি করতে পারে এবং তার উপর শরীআতের হুকুম এ কারণেই অর্পিত হয়। যার আক্বল নষ্ট হয়ে যায়, তার উপর থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়। হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি আক্বল বিক্রি করা যেত তাহলে মানুষ তার মূল্য নিয়ে সীমালঙ্ঘন করত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো মানুষ তার সম্পদ দিয়ে এমন কিছু ক্রয় করছে যা তার আক্বলকে নষ্ট করে দেয়।

হে মুসলিমগণ! অএতব উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, নিশ্চয় মাদকদ্রব্য হচ্ছে আক্বল ও মনুষ্যত্ব এবং সম্মানকে বিনষ্টকারী বড় মাধ্যম। এর মধ্যে সকল প্রকার মাদক ও নেশাদার দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে সকল প্রকার (নেশা সৃষ্টিকারী) পানীয়, ভোজ্য, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় এমন তরল, কঠিন, ট্যাবলেট, পাউডার অথবা বায়বীয় আকারে যা কিছুই হোক তা মাদকদ্রব্য হিসাবে গণ্য হবে। আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর নামের কারণে মাদকদ্রব্যকে হারাম করেননি, বরং তার পরিণতির কারণে হারাম করেছেন। প্রত্যেক যে সকল পানীয় মাদকদ্রব্যের ন্যায় ক্ষতিকর তা মাদকের ন্যায় হারাম।[১] অতএব যা বিবেককে আচ্ছাদন ও বিকারগ্রস্ত করে এবং প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই হলো মদ এবং সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই হারাম। সুতরাং সকল প্রকার মাদকদ্রব্যই হাদীছে বর্ণিত 'খামর' নামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ

১. দারাকুত্বনী, হা/৪৭২৯।

ﷺ বলেছেন, كُلُّ مُسكِرٍ خمرٌ وكُلُّ خمرٍ حرامٌ ‘যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর মদ মাত্রই হারাম’।[২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ‘যে সকল পানীয় নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম’।[৩]

হে আল্লাহর বান্দাগণ! এ কারণে সকল ইসলামী ফক্বীহগণ মাদকদ্রব্য গ্রহণ, তার চাষাবাদ, উৎপাদন ও তাতে মানুষকে অভ্যাস করানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আমি আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে আপনাদেরকে এসবের চোরাচালান ও প্রচলন করা থেকে নিষেধ করছি। এমনকি ইবনু আবেদীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি গাঁজাকে হালাল বলবে সে ধর্মত্যাগী ও বিদআতী। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাশীশ বা গাঁজা মদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট; যা বিবেক ও মেজাজকে বিনষ্ট করে ফেলে।

হে সমবেত মুসলিমগণ! মাদবদ্রব্য হচ্ছে সকল অনিষ্ট, ক্ষতি, বিশৃঙ্খলা ও বিপদাপদের মূল। এটি অনিষ্টের গোপন আস্তানা এবং মাদকদ্রব্যের বিপদের কাছে অন্য সব বিপদাপদ তুচ্ছ। মাদক যুগের সবচেয়ে বড় মুছীবত। এটি বিবেক ও নফসকে নষ্ট করে দেয়। এর মাধ্যমে সম্মান বিনষ্ট হয় এবং এটি সকল অনিষ্ট ও খারাবির মূল। এটি সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি ও শয়তানের কাজ। এর কারণে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ তৈরি হয় এবং এটি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে। মাদক ছালাত থেকে বিমুখ করে দেয় এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সকল সৎ আমল থেকে বাধা দেয়। এটি জীবনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফেলে, আত্মসম্মানবোধকে মিটিয়ে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির থেকে নীতি-নৈতিকতা ও ধীরস্থিরতা দূর হয়ে যায়। এটি শুধু মানবজাতির মধ্যে বেহায়াপনা, নোংরামি ও ক্রোধ-বিদ্বেষেরই প্রসার ঘটায়। মাদক কতই না জীবনের আয়ুষ্কালকে কমিয়ে দিয়েছে! এর কারণে কত সম্পদের বিনষ্ট হয়েছে! কতই না ঘর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে! এর কারণে অনেক মানুষ বন্দী হয়েছে! অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়েছে!

হে সম্মানিত ভাই! মাদকের কারণে আজ বহু ঘর থেকে বিষণ্নতার সংবাদ পাওয়া যায়। এছাড়া আরো কত গোপন রহস্য প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন- একজন যুবক, যে তার যৌবনের উষালগ্নে স্বীয় রবের অনুগত ছিল, উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল, গবেষণায় শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সর্বোপরি একটি সুন্দর জীবনযাপন করছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সেই যুবক খারাপ ও দুষ্ট সঙ্গীর সাহচর্যের ফাঁদে পা দেয়; যে সঙ্গীটি হিংস্র নেকড়ে সদৃশ ও ভ্রান্ত প্রতারক। ফলে হঠাৎ করেই তার সুন্দর জীবনটা ভেঙে খানখান হয়ে যায় এবং তার আলোকজ্জ্বল জীবনের প্রদীপ নিভে যায়। আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্য ফাসেক্বীতে এবং তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, তার সুন্দর চরিত্র অবাধ্যতা ও পশ্চাৎপদতায় রূপ নেয়। শুধু তাই নয়, সেই মেয়েটি যে তার পিতা-মাতার চক্ষু শীতলকারী ছিল। যে তার পরিবার-পরিজনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছিল। যে চরিত্র ও সৌন্দর্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের একজন ছিল। এরপর হিংসুটে ও পথভ্রষ্ট নারীরা তার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সেই দরিদ্র মহিলাটি তাদের পাতানো ফাঁদে ধরা দেয় এবং সে প্রতারকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। এরপর তার দরিদ্র অভিভাবক বুঝতে পারে না যে তাকে অপমান অপদস্থতার সাথে ধরে রাখবে নাকি মাটির মধ্যে পুঁতে দেবে!

হে মুসলিমগণ! এসকল নোংরামিতে নিমজ্জিত ব্যক্তি সুস্থ স্বাভাবিক চিন্তা করতে সক্ষম হয় না। সে সুন্দর কিছু নির্বাচন করতেও সক্ষম হয় না। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজেকে, তার গবেষণাকে, তার কর্তব্যকে, তার সম্পদকে, তার সুখ্যাতিকে, তার সুস্থতাকে এবং তার পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সে একটি অথর্ব, অলস, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে থাকে।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! মাদক প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে দ্বীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং উত্তম আখলাক লালন করা। আল্লাহর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও তাঁর শরীআতকে নিজের জীবনে ধারণ করা। আল্লাহ ফরযকৃত বিধান আদায় করা এবং তাঁর হারামকৃত বিধান থেকে দূরে থাকা। যখন দ্বীনের বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের পথ সহজ হয়ে যায়।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর ইচ্ছায় পরিবার হলো সুন্দরভাবে সন্তানসন্ততির লালনপালনের আদর্শ জায়গা। পরিবার সামাজিক বিপদাপদ থেকে রক্ষার দুর্গ; অচিরেই এসকল সন্তানসন্ততিরা তাদের বাহিরের জীবনে যে বিপদের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে, আল্লাহর সাহায্যক্রমে একটি পরিবার সন্তানদের জীবনকে ভীতসন্ত্রস্ত করে এমন বিষয়কে প্রতিরোধ করতে পারে। পরিবারের অভিভাবকের উপর আবশ্যক হলো, তিনি পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকবেন এবং

২. ছহীহ মুসলিম, হা/২০০৩।
৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৪২; ছহীহ মুসলিম, হা/২০০১।

তাদের কাজের জবাবদিহিতা করবেন। তিনি সন্তানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। তিনি সন্তানদের লালনপালনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করবেন। তিনি মনোযোগ সহকারে সন্তানদের কথা শুনবেন, তাদের সাথে ভালো সময় অতিবাহিত করবেন। তিনি তাদেরকে গুরুত্ব দিবেন এবং তাদের সাথে পারস্পরিক আলাপচারিতায় লিপ্ত হবেন। তিনি সন্তানদের সমস্যাগুলো দেখবেন এবং তারা যে চিন্তাভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেদিকে নযর রাখবেন।

এছাড়া তাদের মাঝে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করা ও তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপ এবং যথাসম্ভব শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরী। তাদের প্রতি তিরস্কার করা, কঠোরতা আরোপ করা এবং তাদেরকে বাড়ির বাহিরে রাত্রি জাগরণ করতে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। অভিভাবকের জন্য সন্তানদের বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্টজনদের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তাদেরকে খারাপ সঙ্গ থেকে বিরত রাখা জরুরী। আর নিঃসন্দেহে অসৎ সঙ্গ অসুস্থতার ঘর।

হে উপস্থিত মুসলিমগণ! মাদক প্রতিরোধ ও মাদক সম্পর্কে সতর্কীকরণে অংশগ্রহণ করা সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করুন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার তাওফীক্ব দিন। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়, মসজিদসমূহে আহলুল ইলমগণ ভূমিকা রাখবেন। লেখক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক, ক্রীড়াবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ ‘হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদি ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ তো শয়তানের নাপাক কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?’ *(আল-মায়েদা, ৫/৯০-৯১)*।

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين...

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যার রহমত সীমালঙ্ঘনকারীদের বেষ্টন করে রেখেছে এবং যার নেয়ামত গণনাকারীদের অপারগ করে দিয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। যার কাছে তওবার মাধ্যমে বড় পাপীরাও ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাঁর উপরে দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আর শান্তির ধারা অবতীর্ণ হোক তাঁর সম্মানিত পরিবার, ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ ও তাদের পরবর্তী অনুসরণকারীদের উপর।

অতঃপর, হে মুসলিমগণ! এই ভয়াবহ বিপদ থেকে সামাজিকভাবে ও ব্যক্তি পর্যায়ে সতর্ক করা সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা এ ব্যাপারে যে পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই ভীতিকর। এছাড়া মাদকের চোরাচালান ও প্রসার ক্রমেই অভিভাবকদের আতঙ্কিত করে তুলছে। এজন্য মাদক প্রতিরোধে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এগিয়ে আসা খুবই জরুরী।

হে মানুষ সকল! আপনারা সকলেই (মাদক প্রতিরোধে) এ সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলোর সাথে পূর্ণমাত্রায় সহযোগিতা করুন। আর আমাদের রাষ্ট্র এই ভয়াবহ মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে তীব্র অভিযান পরিচালনা করছে; এতে নিরাপত্তা, সামাজিক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সকল এজেন্সিগুলো একযোগে তাদের সকল উপাদানগুলো ব্যবহার করে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

সাবধান! আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন। জেনে রাখুন! নিশ্চয় মাদক প্রতিরোধে সকল সমাজের অবস্থান এক ও অভিন্ন। এটি মানুষকে পরিশুদ্ধ করার লড়াই। অতএব সকলের জন্য এই ভয়ংকর শত্রুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিপূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা করা আবশ্যক।

হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সকল ধরনের বালা-মুছীবত থেকে সুস্থতার ফরিয়াদ জানাচ্ছি। আপনাকে সুস্থতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে সকল অপছন্দনীয়, মন্দ জিনিসের অপনোদন চেয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাহলে কবে তুমি নিজেকে চিনবে?*

মূল : ড. আলী তানতাবী
অনুবাদ : সাব্বির আহমাদ

তোমরা হয়তো প্রতিনিয়ত মানুষের সাথে জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবিক, হাস্যকর, মঙ্গল-অমঙ্গল নানাবিধ ঘটনা শুনে থাক। তন্মধ্যে কিছু কথা আছে যা দেশপ্রেম সম্পর্কিত, কিছু বিষয় চরিত্রকে উন্নত করে, কিছু কাহিনীর মাঝে থাকে বিনোদন; থাকে সান্ত্বনা। কিন্তু আমার আজকের এই কথাগুলো সকল কথার চেয়ে অধিক তাৎপর্যবহ। আর হ্যাঁ, আমি যে এর লেখক এজন্য (এটা গুরুত্বপূর্ণ) নয়। ধোঁকায় নিপতিত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। অবশ্য এবিষয়টি তোমাদের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তোমার খুব কাছের। কেননা, তা তোমাদের জন্য এমন এক আয়না, যার দ্বারা নিজেদের চিন্তে পারবে ও নিজেদের ভালো করে পরখ করতে পারবেন।

ওহে জ্ঞানীরা! আমার কথায় হেসো না। ভেবো না যে, আমি তোমাদের সাথে রসিকতা করছি। তোমরা এ কথা বলো না যে, 'আমাদের মাঝে এমন কে আছে যে নিজেকে চেনে না?' নিশ্চয় এথেন্স মন্দিরের দেওয়ালে সক্রেটিসের এই উক্তিটি লেখা ছিল যে, 'ওহে মানুষেরা! নিজেকে চেনো'। সক্রেটিসের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত খুব কম মানুষই পাওয়া গেছে, যারা নিজেকে চেনে!

হে আমার ভাই! সকাল থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত তুমি তো বিভিন্ন কথা, কাজ, হাসিঠাট্টা আর বই নিয়েই মশগূল থাক। তাহলে কবে তুমি নিজেকে চিনবে? তুমি নিত্যদিন সামান্য কিছু সময়ের জন্য হলেও একটু নির্জনে থাকার চেষ্টা করো। ওই সময়টাতে তুমি কেবল ভাবনার সাগরে অবগাহন করো। যখন মাথায় থাকবে না কোনো ব্যবসার চিন্তা, জ্ঞানার্জন অথবা ভোগসামগ্রী নিয়ে কোনো ব্যস্ততা। তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা না করলে আপন সত্তাকে কীভাবে চিনবে? তোমার কার্যকলাপ দেখে বিস্ময় লাগে! সবসময় মানুষের চিন্তায় বিভোর থাক; অথচ নিজেকে নিয়ে ভাবার একটুখানি সময় নেই তোমার! তাহলে কবে তুমি নিজেকে চিনবে?

বলো তো, একটিবারও কি তোমার মনে এই প্রশ্নটি উদয় হয়েছে যে, 'আমি কে?' কেবল আমার এই দেহটাই কি আমি? এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর হাড়-হাড্ডিগুলোই কি আমি?'

নিশ্চয় শরীর কোনো রোগ-ব্যাধিতে নষ্ট হয়ে গেলে পা পঙ্গু হয়ে যায় অথবা হাত কর্তিত হয়। কিন্তু এতে করে আমাতে কোনো কমতি হয় না। অর্থাৎ, আমার 'আমিত্বে' কোনো চির ধরে না।

তাহলে 'আমি' কী?

একদিন তুমি ছিলে শিশু। তারপর তুমি যৌবনে পদার্পণ করলে। এরপর একদিন তুমি প্রৌঢ়ে পরিণত হবে। এতে তোমার মনে একবারও কি এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে যে, 'ওই ছোট্ট শিশুটিই কি এই যুবক? কিন্তু কীভাবে? আমার শরীর তো তার শরীরের মতো নয়। আমার বুঝ আর তার বুঝ তো এক নয়। আমার এই হাতটি তো সেই ছোট্ট হাত নয়। তাহলে ওই হাতটি কোথায় হারিয়ে গেল? আর এটাইবা কোত্থেকে আসলো? ব্যক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে আমি কোনটা? আমি কি ওই শিশুটিই, যে মারা গিয়েছে। যার শরীরের কোনো অংশ এবং চিন্তা-চেতনা আমার মাঝে বিদ্যমান নেই? নাকি আমি সেই প্রৌঢ়, যে এখন এই কথাগুলো উপস্থাপন করছে? নাকি আমি সেই বৃদ্ধ, যে তার রূপ ধরে বলহীন দেহ আর পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক নিয়ে অচিরেই আগমন করবে'।

তুমি বলো যে, 'আমি আমার নফসের সাথে কথা বলছি এবং আমার নফস আমার সাথে কথা বলছে'। এভাবে কি তুমি কখনো ভেবেছ, 'তুমি কে? তোমার নফস কে? তোমাদের মাঝে সীমারেখাটা কী? কীভাবেই-বা তুমি তার সাথে কথা বলবে অথবা সে তোমার সাথে কথা বলবে?'

প্রাতঃকালে তুমি একটি ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে। যা তোমাকে জাগ্রত করার জন্য ডাক দিবে— সময় হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তুমি তোমার মনের গহীন থেকে একজন আহ্বানকারীকে অনুভব করবে, যে তোমাকে ঘুম থেকে জেগে ওঠার আহ্বান জানাবে। অতঃপর তুমি যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে, দুজন আহ্বানকারী তোমাকে ডাকতে আরম্ভ করবে। তন্মধ্যে একজন আরো খানিক সময় ঘুমিয়ে

* صور و خواطر গ্রন্থ থেকে অনূদিত, পৃ. ৪৭-৫০।

www.al-itisam.com

নেওয়ার আমন্ত্রণ জানাবে। তখন তুমি বিছানার উষ্ণতা এবং তন্দ্রার স্বাদ উপলব্ধি করবে। অতঃপর দুজন আহ্বানকারীই তোমাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগবে। জাগরণের আহ্বানকারী আর নিদ্রার আহ্বানকারী।

তুমি কি জানো, এটা কী এবং ওটা কী? আর তুমি তাদের মাঝে কী?

এটা হচ্ছে নফস, যা তোমার জন্য পাপকে সুশোভিত করে দেয় এবং তার স্বাদকে তোমার সামনে চিত্রিত করে তুলে ধরে। আর তোমাকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যায়। আর ওটা হচ্ছে আক্বল, যা তোমাকে তার থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় এবং তা হতে দূরবর্তী করে দেয়।

তুমি কি কোনোদিনও ভেবেছ, মন্দের প্রতি অত্যধিক নির্দেশকারী 'নফস' কী এবং তা হতে প্রতিহতকারী 'বিবেক' কী? আর তুমি কী?

প্রবৃত্তি যখন তোমাকে উত্তেজিত করে ফেলে, তখন তুমি মনে কর, পুরো পৃথিবীটাই বাসরঘর আর এই জীবনটা শুধু দেহ সম্ভোগের জন্যই। কামনা-বাসনাগুলো তোমার মাঝে এমনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যে, যদি তা শয়তানকেও দেওয়া হয়, তাহলে এর বীভৎসতায় শয়তানও আঁতকে উঠত। অতঃপর যখন তোমার প্রবৃত্তি দমিত হয়, তখন এই বাসনাকে দুনিয়ার সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণ্য জিনিস মনে হয় তোমার কাছে। তখন তোমার মনে হয়, সেই স্থানে পৌঁছা অপেক্ষা অধিক নির্বুদ্ধিতার কাজ আর কিছুই হতে পারে না। তোমার মন-মাঝারে উষ্মার ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। তখন নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মাঝেই তুমি তৃপ্তি খুঁজে পাও। নিজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েই তুমি আহ্লাদিত হও। তুমি হিংস্র প্রাণীর ন্যায় চলতে থাক। তোমার মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হয়। অতঃপর রাগ যখন তোমার থেকে বিদায় নেয়, তখন যাতে তুমি স্বাদ পেতে তার মাঝে ব্যথা অনুভব কর এবং তোমার কৃত কামনার জন্য অনুশোচিত হও।

তারপর তুমি বিভিন্ন ইতিহাস, কাহিনী এবং কবিতা পাঠ কর। তখন এমন অনুভব কর যেন একজন ফেরেশতা তোমাকে স্থির করে দিয়েছেন। ফলে তুমি যেন পুরো বিশ্ব ডানাহীন উড়ে বেড়াচ্ছ। তার উত্তমতা ও সৌন্দর্যতা অবলোকন করছ। তারপর তুমি বই রেখে দেও। কিন্তু ওই বিশ্বের কোনো ছিটেফোঁটাও তুমি নিজের মাঝে এবং বাস্তবতায় খুঁজে পাও না। তুমি কি একবারও জানতে চেয়েছ, ওসব কিছুর মাঝে আমি কোনটি? আমি কি ওই প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষটি, যে প্রতিটি হারাম কাজ ভোগ করে এবং প্রত্যেক কদর্যময় কাজ হালাল মনে করে? নাকি ওই ভয়ংকর লোকটি, যে তার ভাইয়ের রক্তপান করে, তাকে শাস্তি দেওয়ার মারফত খাদ্যলাভ করে এবং তাকে কষ্ট দিয়েই নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে? নাকি ওই উন্নত চরিত্রবান ব্যক্তিটি, যে নির্মল গগনে ডানাহীন উড়ে বেড়ায়? আমি কি হিংস্র প্রাণী, নাকি শয়তান, নাকি ফেরেশতা?

তুমি কি জানো, তুমি অনন্য, তুমি অভিজ্ঞ, তুমি একের ভিতর অনেক, তুমি অজ্ঞেয় এক জগৎ? তুমি তৈরি করতে পার অজানা এক পৃথিবী। তুমি আবিষ্কার করতে পার বায়ুমণ্ডলের স্তর। কিন্তু সর্বদায় তুমি নিভৃতে থেকেছ। কেউ তোমার সুপ্ত প্রতিভা উদ্ঘাটন করেনি। তুমি কি একবারও নিজের মাঝে প্রবেশ করে তোমার অজ্ঞতাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছ?

তোমার মন হলো এক বিস্ময়কর বিশ্ব। যা কখনো স্ব স্থানে বহাল থাকে না। যখন তুমি কাউকে ভালোবাসবে, তখন সে তোমার কাছে ফেরেশতা বনে যায়। কিন্তু যখনই তাকে আর ভালো লাগে না, তখন তাকে শয়তান মনে হয় তোমার কাছে। কিন্তু সে তো কখনো ফেরেশতাও ছিল না; ছিল না কোনো শয়তানও। সে পরিবর্তন হয়নি। বরং তোমার মনের অবস্থাই পরিবর্তন হয়েছে। তেমনিভাবে, যখন তুমি আনন্দিত থাক, তখন পুরো দুনিয়াটাকে হাস্যোজ্জ্বল মনে হয় তোমার কাছে। এমনকি তখন তুমি যদি চিত্রকর হতে, তাহলে তুমি তোমার স্লেটে রংতুলির আঁচড়ে এর চিত্রটা এঁকে ফেলতে। অতঃপর যখন তুমি বিপাকে পড়, তখন এই বসুন্ধরাকে তুমি ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পাও। যেন তা শোকের আঁধারে ছেয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়া তো কখনো কাঁদেও না, হাসেও না। বরং তুমিই কাঁদ, তুমিই হাস।

তাহলে তোমার মাঝের রূপান্তরটা কী? দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার কোন বিধানটি অতি সত্য? কোন চিন্তাটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ? যখন তুমি বিপদে নিপতিত হও, তখন তোমার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। দুনিয়াটাকে বিষাদ লাগে। বাগানের সৌন্দর্যতা হারিয়ে যায়। সূর্যের কিরণ নিভে যায়। চাঁদের শুভ্রতা কালো হয়ে যায়। তুমি দার্শনিক হলে, দুনিয়াটা অমঙ্গলের দর্শনে ভরপুর হয়ে যায়। আর কবি হলে, তোমার

কর্ণকুহরে শুধু প্রতিধ্বনিত হয় কষ্টের গান। অতঃপর এক কাপ ভ্যারেণ্ডার[১] তেল দিয়ে যখন তোমার ব্যথা নির্বাপিত হয়, তখন তোমার দর্শনের অমঙ্গলতাও দূরীভূত হয় এবং কবিতাস্থিত কষ্টের পঙতিগুলোও হারিয়ে যায়।

হে মানুষ! যদি এক কাপ ভ্যারেণ্ডার তেল না থাকত, তাহলে তোমার দর্শন আর কবিতার কী অবস্থা হতো? তাহলে তুমি দুর্বল হয়ে যেতে। তোমার শরীর হয়ে যেত নিস্তেজ। নড়াচড়াও করতে পারতে না তুমি। অতঃপর যখন এক কম্পন সৃষ্টি হলো এবং খুশির ঢল নেমে এলো, তখন তুমি এমনভাবে লাফিয়ে উঠলে, যেন তুমি কোনো রশি থেকে ছুটে এসেছ অথবা হরিণের দৌড়ের ন্যায় দৌড়াচ্ছ। তাহলে তোমার এই শক্তি কোথায় সুপ্ত ছিল? তোমার মনে কি একবারই এই শক্তি-সন্ধানের চিন্তা উদয় হয়নি? রাগান্বিত অথবা আনন্দিত অবস্থায় তুমি নিজেকে একবারও জিজ্ঞেস করেছ, কীভাবে এগুলো হচ্ছে?

হে ভাই! নিশ্চয় মন হলো বহতা নদীর ন্যায়। যার ফোঁটা কখনো সে স্থানে স্থির থাকে না। স্ব অবস্থায় অবিচল থাকে না একটি মুহূর্তও। সে চলে যায় এবং অপরটি এগিয়ে আসে। সে তার পেছনের জনকে ধাক্কা মারে, পেছনের জন আবার তাকে ধাক্কা দেয়। প্রতিটি মুহূর্তেই কেউ বাঁচে, কেউ মরে। আর তুমি হলে সব। তুমি বাঁচ আবার তুমিই মর। অতএব, তুমি পূর্ণতা লাভ করো। উপরে ওঠো। সদা জন্ম দিয়ে যাও। সংস্কার করো। সুদক্ষ হও। কখনো বলো না— আমি তা পারব না। নিশ্চয় তুমি তো সর্বদায় বৃক্ষের সতেজ ডালের ন্যায়। কেননা, অন্তর কখনো শুকিয়ে যায় না এবং স্ব অবস্থায় অবিচল থাকে না। যদিও অবস্থা এর বিপরীত হয়।

ধরো, তুমি সবসময় দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে অভ্যস্ত। অতঃপর ধীরে ধীরে তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করলে। অবশেষে দেখবে, এটা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তখন তুমি বিস্মিত হয়ে যাবে— কীভাবে এত রাত জেগে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল! আবার মনে করো, তুমি একজন নিয়মিত মদ্যপায়ী। তোমার ধারণা— কখনোই তুমি মদপান করা ছাড়তে পারবে না। তারপর একসময় যখন তুমি মদ্যপান ছেড়ে দাও, তখন তুমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগবে— ছি! কীভাবে আমি তা পান করতাম! তেমনি ধরো, তুমি কোনো মেয়েকে ভালোবাস। তখন তুমি মনে কর, তাকে ছাড়া তুমি বাঁচতে পারবে না। তারপর কোনো একদিন তোমাদের মাঝে ব্রেকআপ হয়ে যায় এবং তুমি তাকে ভুলে যাও। তখন তুমি ভাবতে থাক— কীভাবে আমি ওকে ভালোবাসতাম! অর্থাৎ, তোমার সেই সাবেক প্রেমিকার প্রতি এক ধরনের ঘৃণা বিরাজ করবে তোমার মাঝে।

অতএব, তুমি কখনো বলো না— আমি তা ত্যাগ করতে পারব না। নিশ্চয় সর্বদাই তুমি একজন যাত্রী। এরকম প্রত্যেকটি অবস্থাই তোমার জন্য একেকটি স্টেশন। সুতরাং, তুমি তা থেকে যাত্রা শুরু করার পূর্বেই তাতে অবতরণ করো না।

হে ভাই! নিজেকে চেনো। নির্জনে থাকো। একান্ত বিষয়গুলো নিয়ে ডুবে থাকো। সর্বদাই জনতে চেষ্টা করো— নফস কী? বিবেক কী? জীবন কী? বয়স কী? শেষ পরিণতি কী?

কখনো ভুলে যেয়ো না, যে নিজেকে চেনে— সে তার রব, তার জীবন ও প্রকৃত স্বাদ চিনতে পারে। নিশ্চয় সবচেয়ে বড় শাস্তি তাকেই দেওয়া হবে, যে তার রবকে ভুলে যায়। আর সে-ই তো তার রবকে ভুলে যায়, যে নিজেকে ভুলে যায়। যে নিজেকে চেনে না।

আত্ব তাক্বওয়া স্টোর
নির্ভেজাল পন্যের প্রচেষ্টায়, ইন শা আল্লাহ
AT TAQWA STORE
আমাদের পেইজে থাকা পণ্যসমূহ ও মুল্য তালিকা :
- লিচু ফুলের মধু - ৫৫০ টাকা/কেজি
- কালিজিরা মধু - ৯৬০ টাকা/কেজি
- খাঁটি গাওয়া ঘি - ১৩০০ টাকা/কেজি
- মেশিনে ভাঙানো সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- ঘানি ভাঙ্গা সরিষার তেল - মুল্য জানতে কল করুন
- কালোজিরার তেল - ১০০ মিলি - ১৮০ টাকা
- খেজুরের গুড় - ২৭০ টাকা/কেজি
১৫০০ টাকার অর্ডার করলে কুরিয়ার চার্জ ফ্রি
অর্ডার করতে কল করুন : ০১৫৭৫ ২৪৫ ৮৭২

১. বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি প্রশমিত করতে ভ্যারেণ্ডার তেল ব্যাবহার করা হয়। —অনুবাদক

আমাদের দুনিয়ার জীবন : ভুল পথচলা

*-মোশতাক আহমাদ**

দুনিয়ার জীবনটা চাকচিক্য আর শয়তানের ধোঁকবাজিতে পূর্ণ। আমরা যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করি, তাদের অধিকাংশের জীবনটা চলছে নিম্নোক্ত ধারায় :

১. শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের একটা অংশ শিক্ষা অর্জন। তা-ও আবার দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন, চাকরি পাওয়া অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে। ২. চাকরি খোঁজা ও পাওয়া অথবা কোনো ব্যবসায় জড়িত হওয়া। ৩. বিয়ে-শাদী করা। ৪. সংসার পরিচালনা করা, সন্তানসন্ততি লালনপালন, তাদের শিক্ষা দান সেই একই, যাতে তারা চাকরি পায় অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করতে পারে। ৫. সন্তানাদির বিয়ে-শাদী দেওয়া। ৬. কর্মজীবন থেকে অবসর। ৭. মৃত্যুর অপেক্ষা অতঃপর জীবনাবসান।

উপরিউক্ত ধারায় জীবন চালাতে গিয়ে মুসলিম হওয়ার দাবিদারগণ ধর্ম পালন বলতে যা করেন, তা হলো:

১. ছালাত পড়া (অধিকাংশই ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মতো মনোনিবেশ ও একাগ্রতাবিহীন, যার দরুন ছালাত হয় শুধু শারীরিক ব্যায়াম। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ বলতে যা বোঝায় তা হয় না মোটেও।) ২. ছিয়াম রাখা (যেভাবে ছিয়াম আদায় করলে সত্যিকার আল্লাহভীতি অর্জন হয়, সেভাবে নয়।) ৩. যাকাত দেওয়া— যথেষ্ট অবহেলা সহকারে। ৪. হজ্জ পালন— অনেকেরই সামর্থ্য ও সুযোগ হয় না। ৫. ঈদুল আযহায় কুরবানী দেওয়া। ৬. নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে মীলাদ পড়ানো, কুলখানি করা। ৭. মৌলভী মারফত বিয়ে পড়ানো ইত্যাদি।

এই পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়া আর প্রিয় নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ রাসূল ও নেতা হিসেবে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি শুধু উপরিউক্ত কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মুসলিম বলে ধরে নেওয়ার জন্য? কক্ষনই নয়।

আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে আমাদের দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আমরা সে উদ্দেশ্যের অনেক দূর দিয়ে চলছি, জীবন পরিচালনা করছি। আর এতে যা হচ্ছে তা হলো, আমাদের দুনিয়ার জীবনে প্রতিনিয়ত অশান্তির মধ্যে কাটছে। সুখ বা শান্তি যা ভোগ করছি বলে মনে হয়, তা একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। আর পরকাল পুরোপুরি অন্ধকার।

যদি এমনটিই হয়, তাহলে যেভাবে যে ধারায় আমরা জীবন চালাচ্ছি তা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়? তাই আমাদের এখনই ভাবতে হবে। যে অবস্থায়, বয়সের যে স্তরেই থাকি না কেন বাকী জীবনটা আল্লাহর নির্দেশিত উপায়ে পরিচালনা করে অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য শুদ্ধ নিয়্যতে তওবা করলে মুক্তির আশা এখনও করা যেতে পারে। কারণ আল্লাহ রহমানুর রহীম, তিনি গফূরুর রহীম। কিন্তু পরকালে কোনো উপায়ই থাকবে না। শত কান্নাকাটি বা মিনতি করেও কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

আমরা যারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করি, তারা সবাই পবিত্র কুরআনকে আমাদের ধর্মগ্রন্থ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ‘আর এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এটা তো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী, যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোনো সন্দেহ নেই (এটা) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে’ *(ইউনুস, ১০/৩৭)*।

সন্দেহের ঊর্ধ্বে অবস্থিত পবিত্র কুরআনে দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে কুরআনে এসেছে, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ‘এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত’ *(আল-আনকাবূত, ২৯/৬৪)*।

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ‘হায়’ বলে যাদের ব্যাপারে আফসোস প্রকাশ করেছেন— দুনিয়া ও পরকালের আসল রূপটা অনুধাবন করতে পারল না বলে। ভেবে দেখুন, আমরা সেই দুর্ভাগাদের দলেই পড়ে গেছি কিনা! দুনিয়ার জীবন যদি আমাদের কাছে নিছক খেলা ও মন ভুলানোর বিষয় না হয়ে থাকে, সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিরন্তর স্বপ্ন দেখা ও সেজন্য অবিরাম চেষ্টা চালানোর ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়, তাহলে তো আমরা চরম দুর্ভাগা।

এবার আপনি আপনার জীবনের গোটা কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করুন। দেখুন, আপনি দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করছেন দুনিয়া পাবার জন্য নাকি আখেরাত পাবার জন্য? জবাব আপনি খুঁজে পাবেন সহজেই। যদি অনুধাবন করেন দুনিয়ার জন্যই সব ব্যস্ততা আপনার, তাহলে শুধরে নিন নিজেকে। কারণ আমরা মূলত দুনিয়ার চাকচিক্যের কাছে নিজেদেরকে লুটিয়ে দিয়েছি।

চোখ দুটো বন্ধ হলেই কিন্তু অন্য জগৎ— পরকাল। চিরতরে চোখ বন্ধ হবে যেদিন, পরকালে প্রবেশ সেই দিনেই। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ নেই আর। সুযোগ নেই ঐ জগতে আপনার সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য নিজের কোনো সম্পদ বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিজনকে, যাদের জন্য জীবনটা উৎসর্গ করেছেন।

অতএব, দুনিয়ার জীবন শুধু দুনিয়া পাবার জন্য নয়। আসুন, দুনিয়ার জীবন কাজে লাগাই পরকাল পাবার জন্য। আর মহান আল্লাহ তাআলা যাদের দুর্ভাগা বোঝাতে চেয়েছেন সূরা আল-আনকাবূতের ৬৪ আয়াতে, সেই দুর্ভাগাদের তালিকা থেকে নিজেদের নামটা কাটাবার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

* বনানী, ঢাকা।

গ্রন্থ পরিচিতি-১৫ : আল-লামহাত

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা গ্রহণ করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প উপায় নেই। রাসূল ﷺ-এর দেওয়া উপহারকে তথা সুন্নাতকে ছোটোখাটো বলে উপহাস করা বা তুচ্ছ করা কুফরী। তেমনিভাবে বিভিন্ন যঈফ ও জাল হাদীছের মাধ্যমে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতসমূহকে বাতিল করারও কোনো উপায় নেই। যে সকল গ্রন্থে তাক্বলীদপন্থিদের দাঁতভাঙা জবাব প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লামা রঈস নাদভী রহিমাহুল্লাহ লিখিত 'আল-লামহাত' গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিচে গ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

নাম ও বিবরণ : গ্রন্থটির নাম اللمحات إلى ما في أنوار الباري من الظلمات। 'আল-লামহাত ইলা মা ফী আনওয়ারিল বারী মিনায যুলুমাত'। দেওবন্দীদের পক্ষ হতে লিখিত 'আনওয়ারুল বারী শরহে বুখারী' গ্রন্থের জবাবে এটি লিখিত হয়েছে। উক্ত বইয়ের মধ্যে দেওবন্দী লেখক মুহাদ্দিছ ইমামদের উপর চরমভাবে আক্রমণ করেছেন এবং চড়াও হয়েছেন। 'আল-লামহাত' গ্রন্থপ্রণেতা এর মধ্যে সেসব মিথ্যাচার, অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনী পরিচালন করেছেন এবং দেওবন্দীদেরকে দাঁতভাঙা জবাব প্রদান করেছেন। গ্রন্থটির পাঁচটি খণ্ড রচিত হওয়ার পর মুহতারাম লেখক রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান। অদ্যাবধি এই গ্রন্থের কোনো জবাব দেওবন্দীদের পক্ষ হতে প্রদান করা হয়নি। গ্রন্থটি ভারতের বিখ্যাত সালাফী মাদরাসা জামি'আহ সালাফিয়্যাহ বানারস হতে মুদ্রিত হয়।

বৈশিষ্ট্যসমূহ : এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এক কথায় বুঝানো অসম্ভব। লেখক প্রতিটি কথার জবাব এমনভাবে দিয়েছেন, তার কোনো নযীর মেলে না। প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে, নম্রতা ও প্রমাণপুষ্ট আলোচনা দ্বারা তিনি বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠাকে এমনভাবে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন, যা পাঠকমাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন। যা অধ্যয়ন না করা পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

যা যা রয়েছে : বৃহদায়তন পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে এত বেশি ইলমী ও তাহক্বীক্বী গবেষণালব্ধ আলোচনা রয়েছে, যা অধ্যয়ন করলে যে কোনো আলেম মুগ্ধ হতে বাধ্য। নিচে সংক্ষেপে সূচিপত্রাকারে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো—

(১) প্রশংসাবাণী : আল্লামা ছূফী আহমাদ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ এটির একটি ভূমিকা রচনা করেছেন এবং তিনি সেখানে গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লামা সূফী আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হলেন মদীনার হাদীছ বিশারদ শায়খ রবী ইবনে হাদী আল-মাদখালী রহিমাহুল্লাহ-এর উস্তায। যার কাছে রবী ইবনে হাদী রহিমাহুল্লাহ উছূলে হাদীছ, ইলমুর রিজালের উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছেন।

(২) ভূমিকা : এটি প্রণয়ন করেছেন আল্লামা উযায়ের শামস রহিমাহুল্লাহ। যিনি ইলমুর রিজাল, নুসখার তাহক্বীক্ব এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ-এর গ্রন্থাবলির উপর ব্যাপক খেদমত করেছেন।

(৩) মুহাদ্দিছদের উপর মিথ্যাচারের জবাব : প্রথম খণ্ডে মুহাদ্দিছ ইমামদের উপর আরোপিত কতিপয় মিথ্যাচারের জবাব প্রদান করা হয়েছে।

(৪) ৪০ জন ফিক্বহ কমিটি : হানাফীদের ৪০ জন ফিক্বহ কমিটির ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু জবাব প্রদান করা হয়েছে।

(৫) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর উপর অভিযোগের জবাব : ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর উপর যে সকল অভিযোগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে।

(৬) হানাফী শীর্ষস্থানীয় ইমামদের সম্পর্কে তাহক্বীক্বী আলোচনা করা হয়েছে।

(৭) আবূ হুরায়রা, ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এবং আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা কর্তৃক বর্ণিত কয়েকটি হাদীছের ব্যাপারে সমুচিত জবাব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আরো অনেক গবেষণাপূর্ণ বিষয় এ গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে। যার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে বড় একটি বই রচিত হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার পরিচিতি : এই অতীব মূল্যবান গ্রন্থটির লেখক আল্লামা রঈস নাদভী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে 'মাসিক আল-ইতিছাম' পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে।[১]

উপসংহার : পরিশেষে এটাই বলতে হয় যে, যাদের মাধ্যমে আমরা হাদীছ শাস্ত্র পেয়েছি; তাদের উপর অতর্কিত হামলার জবাব হিসেবে এই গ্রন্থটি অতীব সুখপাঠ্য ও ইলমী ও তাহক্বীক্বী তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর। সুতরাং প্রতিটি আলেমকে এই গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠ করা উচিত। উল্লেখ্য, গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের অনুবাদ চলমান। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটি ক্বিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন এবং এর লেখককে জান্নাতবাসী করুন- আমীন!

১. মাসিক আল-ইতিছাম, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জুন ২০২৩, পৃ. ৩৭।

রবের নেয়ামত

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

চারিদিকে দেখি যাহা
দৃষ্টি শীতল করে,
আল্লাহ তোমার নেয়ামতে
রেখেছো তো ভরে।
আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি
সবি দিলে তুমি,
চোখের তারায় আলো দিলে
মন চায় ঐ পদ চুমি!
সাগর ভরা পানি দিলে
মাঠ ভরা ঐ ফসল,
তোমার পথে চলার জন্য
কুরআন করল সফল।
রবের কৃপা শেষ হবে না
বর্ণনা করি যতই,
চোখের অশ্রু পড়বে ঝরে
বাড়বে মনে ক্ষতই।

মুনাফেক্ব

-জিশান মাহমুদ
শ্রীবরদী, শেরপুর।

রাসূল বলেন আচরণে থাকলে চারটি স্বভাব
তোমার ভিতর রয়ে গেছে ঈমানেরই অভাব।
এমন স্বভাব পুষলে পরে তোমার জন্য ধিক
খাঁটি মুমিন তুমি তো নও তুমি মুনাফেক্ব।
চলতে পথে মুনাফেক্বে কথা যখন বলে
মুখে থাকে এক কথা আর মনে আরেক চলে।
মিথ্যা কথায় এমন করে নিত্য দেয় সে ধোঁকা
মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়ে আমরা হই যে বোকা।
আমানতের ধার ধারেনা খেয়ানতে মজে
পরের মালে আয়েশ করে থাকে চোখটি বুজে।
প্রতিজ্ঞাতে নবাব তিনি রোজই করে পণ
সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে লাগে কতক্ষণ।
বিবাদে সে লিপ্ত হলেই গালাগালি করে
খারাপ ভাষায় জবাব দিয়ে নিজকে তুলে ধরে।
দূরে থেকো এমন স্বভাব যেসব লোকের আছে
তবেই তুমি সৃষ্টিকর্তার থাকবে অনেক কাছে।

লড়াই

-মো. শফিউর রহমান
সহকারী শিক্ষক, পাঁচগাছিয়া সর. প্রাথ. বিদ্যালয়,
কাকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

নিত্য যাদের ভালো চাহি
তারাই দেখি ভুল বুঝে,
যাদের ভালো করি আমি
তারাই আবার ভুল খুঁজে!
আচরণে মানুষগুলো
সত্যি বড় আজগুবি!
মনটা ভীষণ বিষণ্ন যে
ভাবছি বসে আজ খুবই!
মানুষ হয়ে এই মানুষের
খারাপ চাহি কেমনে?
তাইতো আমি স্বভাবদোষে
ভালো চাহি এ মনে!
হাজার ভালো করেও যদি
হয়ে যায় কোনো ত্রুটি,
ভালো সবই হয় যে মাটি,
দেখি শুধু ভ্রুকুটি!
ভালো করার খায়েশ তাইতো
চাপা পড়ে দেয়ালে,
তবু আমি আমার মতোই
কাজ করে যাই খেয়ালে!

নেই ভেদাভেদ

-শাহীন পরদেশী
সাদুল্লাপুর, গাইবান্ধা।

দাওনা সেজে মাগো আমায়
যাব ছালাত পড়তে,
আল্লাহর কাজ করতে হবে
সুন্দর জীবন গড়তে।
ওই ঘরেতে গেলে মাগো
শান্তি খুঁজে পাই,
ছালাত পড়ে রবের কাছে
দু'আ আমি চাই।
ভালো লাগে মাগো আমার
আল্লাহর ওই ঘরে,
ধনী গরীব নেই ভেদাভেদ
সবাই ছালাত পড়ে।

বাংলাদেশ সংবাদ

এক যুগে সাক্ষরতার হার বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ

যিনি পড়তে পারেন, অনুধাবন করতে পারেন, মৌখিক ও লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা, যোগাযোগ স্থাপন ও গণনা করতে পারেন, তাকেই প্রায়োগিক সাক্ষরতার আওতায় হিসাব করা হয়। এই মানদণ্ডে দেশে ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার ৭৩.৬৯ শতাংশ, যা ২০১১ সালে ছিল ৫৩.৭০ শতাংশ। ১২ বছরের ব্যবধানে এ ক্ষেত্রে প্রয়োগিক সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১৯.৯৯ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'প্রায়োগিক সাক্ষরতা জরিপ ২০২৩'-এর প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য। বিবিএস প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে সাত বছর এবং তদূর্ধ্ব মানুষের মধ্যে বর্তমানে প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার ৬২.৯২ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৬৩.৯৭ এবং নারী ৬১.৬৬ শতাংশ। আর সাত থেকে ১৪ বছরের মধ্যে প্রয়োগিক সাক্ষরতার হার ৭২.৯৭ শতাংশ এবং ১৫ বছরের বেশি ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার ৬০.৭৭ শতাংশ। সাত থেকে ১৪ বছরের মধ্যে প্রায়োগিক সাক্ষরতার হারে এগিয়ে আছে মেয়েরা, তাদের হার ৭৬.৪২ শতাংশ আর ছেলেদের হার ৬৯.৬৭ শতাংশ। প্রতিবেদন বলেছে, সাত থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত প্রায়োগিক সাক্ষরতার হারে গ্রামে ছেলেদের সাক্ষরতার হার ৬৭.৮৪ শতাংশ এবং শহরে ৭৩.৯০ শতাংশ এবং গ্রামে নারীর প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার ৭৫.২৫ শতাংশ আর শহরে ৭৯.২২ শতাংশ।

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কেনার সামর্থ্য নেই ১২ কোটি মানুষের

সব দেশেই কিছু মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কেনার সামর্থ্য থাকে না। অপেক্ষাকৃত গরীব দেশগুলোতে এমন মানুষের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। বাংলাদেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কেনার সামর্থ্য নেই। বাংলাদেশের সর্বশেষ জনশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন প্রায় ১৭ কোটি। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনের তথ্য বিবেচনায় আনলে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কিনতে পারে না। স্বাস্থ্যসম্মত খাবার না কেনার তালিকায় বাংলাদেশের ওপরে আছে ভারত, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও চীন। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার কিনতে পারে না। দেশটির ৯৭ কোটি ৩০ লাখ মানুষ মানসম্পন্ন খাবার পায় না। ভারতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর এই দশা। দ্বিতীয় স্থানে আছে আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়া, তৃতীয় স্থানে ইন্দোনেশিয়া, চতুর্থ স্থানে পাকিস্তান, পঞ্চম স্থানে চীন। এ ছাড়া ইথিওপিয়ায় প্রায় ১০ কোটি, কঙ্গোতে আট কোটি, ফিলিপাইনে সাড়ে সাত কোটি ও মিসরে সাত কোটি ৪০ লাখ মানুষের এমন দশা। এর বাইরে পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালে আড়াই কোটি মানুষ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কায় এক কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পায় না। উন্নত ধনী দেশেও এ সমস্যা আছে। তবে সেখানে এমন মানুষের সংখ্যা কম। অন্যতম ক্ষমতাধর ও ধনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও ৪৯ লাখ মানুষ মানসম্পন্ন খাবার কিনতে পারে না।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

প্রভাবশালী খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের ইসলাম গ্রহণ

তার নাম ইবরাহীম রিচমন্ড। বিগত ১৫ বছর ধরে তিনি ছিলেন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় যাজক। এই ১৫ বছরে হাজারো মানুষকে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। সাউথ আফ্রিকার বিখ্যাত এই পাদ্রী এখন ইসলামের বিখ্যাত প্রচারক। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণে এবার তিনি হজ্জও পালন করেছেন। ইবরাহীম রিচমন্ড এখন ইসলামপ্রেমী মানুষদের কাছে এক অনন্য আইকন। তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তিনি এভাবে বলেন, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আগ পর্যন্ত ১৫ বছর যাবৎ আমি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি কংগ্রেশনাল গীর্জার (সংশোধিত প্রোটেস্টেন্ট খ্রিষ্টধর্ম) ধর্মযাজক ছিলাম। ওই গীর্জার আওতায় আমাদের ১০ লক্ষ অনুসারী ছিল। একদিন গীর্জার ছোট্ট একটি কামরায় ঘুমানোর সময় আমি দেখলাম, কেউ একজন আমাকে আহ্বান করছিল, তুমি তোমার অনুসারীদের সাদা পোশাক পরিধানের আদেশ দাও। তখন আমি বললাম, মুসলিমদের মতো! তখন লোকটি বলল, হ্যাঁ। তখন আমি জেগে উঠি। আর মনকে সান্ত্বনা দিই যে, এটা নিছক স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু না! স্বপ্নটি এরপরেও কয়েকবার দেখতে পাই আমি। কিন্তু শেষবারের আহ্বানটি এতই জোরালো ছিল যে, আমার অন্তরের সকল সন্দেহ আর সংশয় দূর হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি যে, আমাকে আমার অনুসারী সমেত

ইসলাম গ্রহণের ইলাহী আদেশ দেওয়া হচ্ছে। তখন আমি গীর্জায় সমবেত হওয়ার পরবর্তী তারিখে স্বপ্নে পাওয়া বার্তা বাস্তবায়নের সংকল্প করি। আল্লাহ কাজটি সহজ করে দিয়েছিলেন। এর পরবর্তী সমবেত হওয়ার তারিখে আমার অনুসারীরা সকলেই গীর্জায় নিজেদেরকে আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে আবৃত করে এসেছিল। সকলেই আমার সাথে একসাথে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফালিল্লাহিল হামদ!

পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেক ১০ দেশের দখলে!

বর্তমানে বিশ্বের সব দেশের অর্থনীতির মোট জিডিপি এখন ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার। তবে এর বড় অংশজুড়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, জার্মানি ও ভারত। বর্তমানে পৃথিবীতে মোট দেশের সংখ্যা শতাধিক। তবে মাত্র ১০টি দেশের কাছেই আছে পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেকেরও বেশি। আর জিডিপির আকারে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি বা বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বলা হয় এদের। ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর প্রায় অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কারেন্সি ডলার বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ মুদ্রা। বর্তমানে দেশটির জিডিপি প্রায় ২৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্বের বৃহত্তম। বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল চীন, দেশটির জিডিপির আকার প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন ডলার যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। ২০২৮ সালের মধ্যে অর্থনীতির আকারে চীনের যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। পূর্ব এশিয়ার দ্বীপ রাষ্ট্র জাপানের অর্থনীতি এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। বর্তমানে জাপানের জিডিপি প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জাপান। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি দেশ জার্মানি, দেশটির মোট জিডিপি প্রায় ৪ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার। বর্তমানে ভারতের জিডিপির আকার ৩ দশমিক চার ট্রিলিয়ন ডলার যা বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম। ২০৫০ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

মুসলিম বিশ্ব

ইসরাঈলীরা ২০০ ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেছে

ইসরাঈলের সেনা সদস্যরা চলতি ২০২৩ সালের এই পর্যন্ত ২০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তীনীকে হত্যা করেছে। অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইয়াহূদীরা এইসব হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এদিকে ফিলিস্তীনের একটি মানবাধিকার সংগঠন তাদের এক নতুন প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৩ সালের এ পর্যন্ত ৫৭০ জন ফিলিস্তীনী শিশুকে আটক করেছে ইসরাঈলী বাহিনী। প্যালেস্টাইন সেন্টার ফর প্রিজনার্স স্টাডিজ (PCPS)-এর পরিচালক রিয়াদ আল আশকার এই তথ্য জানান। এই প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ইসরাঈলী সেনাবাহিনীর হাতে চলতি বছরে ফিলিস্তীনী শিশু আটকের ঘটনা শতকরা ১৫ ভাগ বেড়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, এই ৫৭০ জন শিশু-কিশোরের মধ্যে ৪৩৫ জনকে আটক করা হয়েছে পূর্ব বায়তুল মুকাদ্দাস বা আল-কুদস শহর থেকে। ফিলিস্তীনী মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদনে আরো জানানো হয়েছে, আটক শিশু-কিশোরের মধ্যে ২৯ জনের বয়স ১২ বছরের কম। এছাড়া দুটি শিশুর বয়স মাত্র ১০ বছর। আটক শিশুদের মধ্যে ২৩ জনকে ইসরাঈলী সরকারের প্রশাসনিক ডিটেনশন পলিসির আওতায় জেলবন্দী করা হয়েছে যাদেরকে কোনো অভিযোগ ছাড়া বিনা বিচারে বছরের পর বছর আটক রাখা যাবে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

প্লাস্টিকখেকো ভাসমান কৃত্রিম দ্বীপ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত একটি বিশাল কৃত্রিম দ্বীপ অচিরেই প্রশান্ত মহাসাগরে ভেসে বেড়াবে। শুধু তাই নয়, তার চলার পথে যেখানেই প্লাস্টিক বর্জ্য সামনে পড়বে তা পাকড়াও করবে এবং দ্বীপে থাকা কারখানায় সেই প্লাস্টিক বর্জ্য চূর্ণ করবে। পরে তা তীব্র চাপে সংকুচিত করে মূল দ্বীপের সঙ্গে যুক্ত করবে। এভাবেই ধীরে ধীরে আয়তনে বৃদ্ধি পাবে ভাসমান দ্বীপটি। 'পলিমেরোপলিস' নামের এই দ্বীপ নগরীতে আবাস হবে চার হাজার মানুষের। সেখানে থাকবে সব ধরনের অত্যাধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, টাটকা শাক-সবজি, মাছ, গোশত সবকিছুই থাকবে সেখানে। এক কথায় এ দ্বীপটিতে যারা বসবাস করবেন, তাদের কারও মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। দ্বীপবাসী অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবেন। এমন দ্বীপ তৈরির কারণ সম্পর্কে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রতিবছর ৮০ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রে জমা হচ্ছে। ফলে জীববৈচিত্র্য যেমন মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন এবং তেমনি মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন এখন সামনে চলে এসেছে। আর সে কারণেই জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, সঊদী আরব এবং আরও বেশ কিছু দেশ ভাসমান কৃত্রিম দ্বীপসহ পানিতে বসবাসের মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : অমুসলিমদের শিশুরা মারা গেলে তারা কি জান্নাতে যাবে?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : মুসলিম শিশুরা মারা গেলেও যেমন জান্নাতে যাবে, ঠিক তেমনই অমুসলিম শিশুরা মারা গেলে তারাও জান্নাতে যাবে। সামুরাহ ইবনু জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্বপ্নের বর্ণনাতে বলেন, 'আমরা এক বাগানে আসলাম। সেই বাগানের মাঝে অনেক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছেন, যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এত অধিক আর কখনো আমি দেখিনি। আমি বললাম, উনি কে? এরা কারা? তাকে বলা হলো, যে দীর্ঘকায় ব্যক্তি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু যারা ফিতরাতের (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে'। রাবী বলেন, তখন কিছু ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও' (ছহীহ বুখারী, হা/৭০৪৭)।

প্রশ্ন (২) : কোনো অমুসলিম ব্যক্তি দেশের জন্য যুদ্ধ করে মারা গেলে তাকে শহীদ বলা যাবে কি?

-আনোয়ার হোসেন
কাশিমপুর, গাজীপুর।

উত্তর : না, কোনো কাফের ব্যক্তি তার কুফরী অবস্থাতে মারা গেলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে না। কেননা শহীদ হওয়ার জন্য অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে মুসলিম হতে হবে। আর কাফেরদের কোনো আমলই কিয়ামতের দিন কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং কাফেররূপে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কারো কাছ থেকে যমীনভরা সোনা বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনো কবুল করা হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; আর তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই' (আলে ইমরান, ৩/৯১)। তিনি আরো বলেন, 'আর আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি অগ্রসর হয়ে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' (আল-ফুরকান, ২৫/২৩)।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম হয়েও যদি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্য না করে লড়াই করে নিহত হয়, তবুও সেই ব্যক্তি শহীদ নয়। বরং শহীদ হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করে নিহত হয় (শারহু রিয়াযিস ছালেহীন, ইবনু উছাইমীন, ১/৬৬)।

প্রশ্ন (৩) : আমার প্রশ্ন হলো, হাদীছে আল্লাহ তাআলার যে ৯৯টি গুণবাচক নামের কথা আছে, এই নাম বা গুণাবলি কি সৃষ্ট?

-মো. আব্দুর রহীম
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : না, আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি সৃষ্ট নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা যেমন সৃষ্ট নন, ঠিক তেমনই আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলিও সৃষ্ট নয় (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ৬/১৮৬)।

প্রশ্ন (৪) : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বিচার কোন আইনের ভিত্তিতে হবে, তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী নাকি মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী? আর চুরির জন্য ইসলামে হাত কাটার বিধান অমুসলিমদের উপর প্রয়োগ করা যাবে কি?

-আব্দুর রাজ্জাক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমেদের বিচার ফায়ছালা যেমন ইসলামী শরীআত অনুযায়ী হবে, ঠিক তেমনই অমুসলিমদের বিচার ফায়ছালাও হবে ইসলামী শরীআত অনুযায়ী। কেননা আল্লাহ তাআলা তার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ করে বলেন, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী আপনি তাদের মাঝে বিচার করুন, আর তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না' (আল-মায়েদা, ৫/৪৯)। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে

www.al-itisam.com

বসবাসকারী অমুসলিমদের মধ্যেও কেউ চুরি করলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তার হাত কেটে দেওয়া।

উল্লেখ্য যে, অনেকেই দাবী করে, এক ইয়াহূদী পুরুষ ও ইয়াহূদী মহিলা ব্যভিচার করলে, নবী ﷺ তাদের তাওরাত অনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার করেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮১৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭০০)। কিন্তু আসলে বিষয়টি তেমন নয়। বরং নবী ﷺ তাদের মাঝে ইসলামী শরীআত মোতাবেকই বিচার করেছিলেন, কিন্তু তাওরাত নিয়ে এসে তাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে লাঞ্ছিত করা ও তাদের ওপর হুজ্জত কায়েম করা (হুকমুল জাহিলিয়্যাহ, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ৫৪ পৃ.)।

প্রশ্ন (৫) : আল্লাহর বাণী, 'তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল' (আয-যুমার, ৩৯/৩০)। জনৈক আলেম এই আয়াত দিয়ে বলছেন যে, ঈসা আলাইহিস সালাম মারা গেছেন। এই আয়াত এবং সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য অনুযায়ী জানতে চাই যে, আসলেই কি ঈসা আলাইহিস সালাম মারা গেছেন?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : না, ঈসা আলাইহিস সালাম এখনো মৃত্যুবরণ করেননি। ঈসা আলাইহিস সালাম ও অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; তবে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন শেষ যামানাতে। এখনো তিনি মারা যাননি। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত থাকার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে উপরে তুলে নিয়েছেন (আন-নিসা, ৪/১৫৮)। তিনি শেষ যামানাতে আবার নেমে এসে সাত বছর অবস্থান করবেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত্যুদান করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪০)।

প্রশ্ন (৬) : কিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে কত বছর অবস্থান করবেন, ৭ না ৪০ বছর?

-খাদেমুল ইসলাম

উত্তর : কিয়ামতের আগে ঈসা আলাইহিস সালাম এই দুনিয়াতে এসে সাত বছর অবস্থান করবেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪০)। তবে কোনো কোনো হাদীছে বলা হয়েছে যে, তিনি চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন (আবূ দাঊদ, হা/৪৩২৪)। সেই বর্ণনা দিয়ে উদ্দেশ্য হলো, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর যমীনে অবস্থান করার সময় হবে চল্লিশ বছর। আল্লাহ তাআলা তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার আগে তার বয়স হয়েছিল তেত্রিশ বছর। আর কিয়ামতের আগে তিনি নেমে এসে অবস্থান করবেন আরো সাত বছর। এভাবে তার যমীনে অবস্থান করার সময় হবে চল্লিশ বছর (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১৯/২৩১)।

প্রশ্ন (৭) : ছোট শিশু মারা গেলে তাদের কবরে সওয়াল-জওয়াব হয় কি?

-আব্দুল্লাহ
রহনপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : না, শিশুরা মারা গেলে তাদের কবরে সওয়াল জওয়াব হবে না। কেননা তারা শরীআতের দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে। তারা হলো- ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না সে সাবালক হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়' (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/২০৪১)। কেননা শুধু তাদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যাদেরকে বিবেক দেওয়া হয়েছে ও যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছে। কেননা এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল- এই প্রশ্ন যদি শিশুদেরকেও করা হয়, যাদের ভালো-মন্দ পার্থক্য করার কোনো ক্ষমতা নেই, তাহলে তো এমন প্রশ্ন অর্থহীন (কিতাবুর রূহ, ইবনুল কায়্যিম, ৮৭-৮৮)।

প্রশ্ন (৮) : মৃত শিশু বাচ্চাদের নিয়ে যদি বিদআতী কর্মকাণ্ড হয়, তাহলে কি শিশু বাচ্চার কবরে আযাব হবে?

-আব্দুল মালেক বিন ইদ্রিস
চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : না, মৃত শিশু বাচ্চাদের নিয়ে যদি বিদআতী কর্মকাণ্ড হয়, তাহলে সেই শিশু বাচ্চার কবরে আযাব হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে কলমকে তুলে নিয়েছেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে। তারা হলো- ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে

জাগ্রত হয়, নাবালেগ যতক্ষণ না সে সাবালক হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা সুস্থ হয়’ (আবূ দাঊদ, হা/৪৩৯৮; ইবনু মাজাহ, হা/২০৪১)।

প্রশ্ন (৯) : কার সাথে কার বিয়ে হবে সেটিও কি ভাগ্যে লেখা থাকে?

-আব্দুর রহিম
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ। বিবাহ, রিযিকসহ মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটবে সকল কিছুই তাকদীরে লেখা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের তাকদীর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে লিখেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৩)। তারপর মায়ের পেটে চারমাস বয়সে আবার তাকদীর লিখে দেওয়া হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৩)। তবে সেই তাকদীরের ওপর ভরসা করেই বসা থাকাটা নিন্দনীয়, বরং আমাদেরকে কাজ করতে বলা হয়েছে। কেননা আমরা তাকদীর প্রকাশিত হওয়ার আগে তা জানি না। রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘তোমরা আমল করতে থাক, কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য সৌভাগ্যের অধিকারী লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে, তার জন্য দুর্ভাগা লোকদের আমলকে সহজ করে দেয়া হবে’ (ছহীহ বুখারী, হা/৪৯৪৯)। সুতরাং আমাদেরকে তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে না থেকে কাজ করে যেতে হবে।

প্রশ্ন (১০) : কুরআনে বলা আছে, যারা জাহান্নামে যাবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। কিন্তু ছহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আল্লাহ একসময় মুসলিম জাহান্নামীদেরকে মাফ করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাহলে কি এই হাদীছটি কুরআনের এ আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক?

-আবু যার
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কিছু হাদীছে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে তাওহীদপন্থি বান্দা তার পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও সে তাতে স্থায়ী হবে না, বরং সেখান থেকে একদিন বের হয়ে জান্নাতে যাবে (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২)। পক্ষান্তরে যেসব কুরআনের আয়াতে স্থায়ী জাহান্নামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোতে উদ্দেশ্য হলো কাফের ও মুশরিকরা। কেননা কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না। সেই আয়াতগুলো দিয়ে তাওহীদপন্থি বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। আর হাদীছে তাওহীদপন্থি বান্দাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, তারা তাদের পাপের কারণে জাহান্নামে গেলেও তারা একদিন জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে। সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদীছের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই।

প্রশ্ন (১১) : জনৈক ব্যক্তি আগে অমুসলিম ছিল, বর্তমানে সে পাগল। কিন্তু তাকে সালাম দিলে সে উত্তর দেয়। তাহলে কি তাকে সালাম দেওয়া যাবে?

-মো. মিনহাজ পারভেজ
হড়গ্রাম, রাজশাহী

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি মুসলিম থাকা অবস্থায় পাগল হয়ে যায় তাহলে তার ওপর মুসলিমের বিধান কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টান থাকা অবস্থায় পাগল হয়ে যায়, তারপর সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সেই ইসলাম গ্রহণ সঠিক হবে না, বরং তার ওপর ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টানদের বিধানই কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে কেউ কাফের থাকা অবস্থাতে পাগল হলে তার ওপর কাফেরের বিধানই কার্যকর হবে (মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়্যাহ, ১০/৪৩৬)। এর ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির ওপর অমুসলিমের বিধানই কার্যকর হবে। সুতরাং অমুসলিমকে যেমন সালাম দেওয়া যাবে না, ঠিক তেমনই এমন ব্যক্তিকেও সালাম দেওয়া যাবে না।

শিরক

প্রশ্ন (১২) : নতুন বাড়ি যেখানে এখনও মানুষ বসবাস করতে শুরু করেনি। লোকে বলে যে, রাতের বেলায় আলো জ্বালিয়ে রাখতে হবে তা নাহলে জিনে বাসা বাঁধবে। জিন তাড়ানোর জন্য আলো জ্বালিয়ে রাখা কি ঠিক হবে?

-সিয়াম
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট

www.al-itisam.com

উত্তর : এগুলো সামাজিক কুসংস্কার মাত্র, যেগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তবে যদি বাড়িতে আসার পরে জিনের দ্বারা কোনো সমস্যা হয়, তাহলে সেই বাড়িতে নিয়মিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত করবে, বিশেষভাবে সূরা আল-বাকারা পাঠ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের ঘরসমূহকে কবর সদৃশ করে রেখ না। আর যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৮০)।

প্রশ্ন (১৩) : আমাদের গ্রামের মসজিদের খতীব সাহেব জুমআর খুৎবায় বলেছেন, সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা ইখলাস ও আরো একটি দু'আ পড়ে হাতে তালি মারলে এই তালির শব্দ যত দূরে যাবে ততটুকু জায়গার মধ্যে কোনো জিন প্রবেশ করতে পারবে না। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বগুড়া।

উত্তর : এগুলো বানোয়াট কথা, যা বর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৪) : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমআর খুৎবায় তেলাওয়াতের সময় রাসূল ﷺ-কে 'কিবলাতানা' বলে উল্লেখ করেন। এটা বলা কি সঠিক?

-মো. জসিম উদ্দিন খান
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, বি. বাড়িয়া শাখা।

উত্তর : রাসূল ﷺ হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তার অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। কোনো ব্যক্তিই তার অনুসরণ ব্যতীত জান্নাতে যেতে পারবে না (ছহীহ বুখারী, হা/৭২৮০)। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার অনুসরণ করার ও তাঁর নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন (আল-হাশর, ৫৯/৭)। এমনকি রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করাকে আল্লাহর আনুগত্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আন-নিসা, ৪/৮০)। এই সম্মান ও মর্যাদার দিকে খেয়াল রেখেই ছাহাবীগণ রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু কেউ তাকে 'কিবলাতানা' বলে সম্বোধন করেছেন বলে জানা যায় না। আর রাসূল ﷺ-কে 'কিবলাতানা' বলা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িকারী সুফিবাদী ও পীরপন্থিদের আক্বীদা ও পরিভাষা। সালাফগণ এসব শব্দ ব্যবহার করতেন না। তাই এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১৫) : অযূর পর লোশন ব্যবহার করলে আবার অযূ করতে হবে কি?

-ইমতিয়াজ
পবা, রাজশাহী।

উত্তর : অযূ ভঙ্গের যেই কারণগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে লোশন ব্যবহার করা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং অযূর পরে লোশন ব্যবহার করলে পুনরায় অযূ করতে হবে না।

ছালাত

প্রশ্ন (১৬) : ছালাতে কখন রাফঊল ইয়াদাইন করতে হয়?

-আব্দুর রাযযাক
রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় এবং ২য় রাকআত থেকে উঠে দাঁড়াবার সময় রাফঊল ইয়াদাইন করতে হবে। নাফে' রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দুই হাত উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন। এরপর যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন এবং দুই রাকআত ছালাত আদায়ের পর যখন দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত উঠাতেন। এ সমস্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বলে ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৩৯)।

প্রশ্ন (১৭) : আছরের ছালাতে যদি ইমামের সাথে দুই রাকআত পায়, তবে বাকী দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোনো সূরা পড়তে হবে কি?

-মতিউর রহমান
পাবনা।

উত্তর : না, বাকী দুই রাকআতে অন্য সূরা মিলাতে হবে না। শুধু সূরা ফাতিহা পড়লে হয়ে যাবে। কেননা মাসবুক

ইমামের সাথে যেটুকু পায় তা তার ছালাতের প্রথমাংশ হয়। কাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, তুমি ইমামের সাথে ছালাতের যে অংশ পাবে তা তোমার প্রথম ছালাত। সুতরাং ছালাতের যতটুকু ছুটে গেছে তা পূর্ণ করো (দারাকুৎনী, হা/১৫১৫)।

প্রশ্ন (১৮) : সিজদায় আগে হাত রাখবে, নাকি হাঁটু রাখবে?

-মাহফুজুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখতে হবে এবং পরে হাঁটু রাখতে হবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে, তখন যেন উটের বসার ন্যায় না বসে, বরং দুই হাতকে যেন হাঁটুর পূর্বে যমীনে রাখে' (আবূ দাঊদ, হা/৮৪০; নাসাঈ, হা/১০৯১)।

প্রশ্ন (১৯) : আমরা জানি, প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়তে হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, নফল বা সুন্নাত ছালাতের পরও আয়াতুল কুরসী পড়লে বিদআত হবে কি?

-মোসা. মানসুরা খাতুন
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : ফরয ছালাত ছাড়াও নফল ও সুন্নাত ছালাত পরেও আয়াতুল কুরসী পাঠ করা যাবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পড়বে তাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো কিছুই জান্নাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না' (ছহীহুল জামে, হা/৬৪৬৪)। অত্র হাদীছে প্রত্যেক ছালাত পরেই আয়াতুল কুরসী পাঠ করার কথা বলা হয়েছে, যা ফরযসহ নফল ও সুন্নাত ছালাতকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন (২০) : বাম হাতে তাসবীহ গণনা করা যাবে কি?

-আতাউর রহমান
ঢাকা।

উত্তর : ডান হাতেই তাসবীহ গণনা করতে হবে। বাম হাতে তাসবীহ গণনা করা যাবে না। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আঙ্গুলের দ্বারা তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। ইবনু কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ডান হাতের আঙুল দ্বারা গণনা করতে হবে (আবূ দাঊদ, হা/১৫০২)। আবার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি ভালো কাজ ডান দিক দিয়ে শুরু করা পছন্দ করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯২৬)।

প্রশ্ন (২১) : স্বেচ্ছায় কেউ জামাআতে ছালাত আদায় না করলে তার হুকুম কী?

-নাছরুল্লাহ
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উত্তর : জামাআতে ছালাত আদায় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাকীদপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ তাআলা তার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যুদ্ধের সময়েও জামাআতে ছালাত আদায় করার আদেশ করেছেন (আন-নিসা, ৪/১০২)। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনা ওযরে জামাআত থেকে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৭, ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫১)। আবার নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে স্পষ্ট মুনাফিকরা ছাড়া জামাআত থেকে কেউই পিছিয়ে থাকত না (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৫৪)। এই বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, বিনা ওযরে জামাআত ত্যাগ করা জায়েয নয়। কোনো ব্যক্তি বিনা ওযরে জামাআত ত্যাগ করলে সে গুনাহগার হবে এবং একাকী ছালাত আদায় করলে তার নেকী কম হবে।

প্রশ্ন (২২) : আমি রাতে উঠে বিতর ছালাত পড়ব বলে ঘুমিয়ে যাই, কিন্তু রাতে উঠতে পারি না। এতে আমার মাঝে মধ্যে বিতর ছালাত ছুটে যায়। আমার প্রশ্ন হলো, বিতর ছালাত না পড়লে কি গুনাহ হবে?

-রুবেল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর : বিতর ছালাত আদায় না করলে গুনাহ হবে। কেননা বিতর ছালাত হলো গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে ও সফরে কোনো সময়ই ছাড়তেন না, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর ছালাত আদায় করো। কেননা আল্লাহ বেজোড়, তাই তিনি বেজোড়কে ভালোবাসেন' (আবূ দাঊদ, হা/১৪১৬)। ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী

www.al-itisam.com

ﷺ সফরে ফরয ছালাত ব্যতীত তাঁর সওয়ারী হতেই ইঙ্গিতে রাতের ছালাত আদায় করতেন, সওয়ারী যে দিকেই ফিরুক না কেন। আর তিনি বাহনের উপরেই বিতর আদায় করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১০০০; ছহীহ মুসলিম, হা/৭০০)। তাই বিতর ছালাত না ছেড়ে তা নিয়মিতভাবে আদায় করার চেষ্টা করতে হবে।

উল্লেখ্য, যারা শেষ রাতে জাগতে পারবে বলে আশা রাখে তাদের জন্য শেষ রাতেই বিতর ছালাত আদায় করা উত্তম। কেননা ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলতেন, তোমরা বিতরকে রাতের শেষ ছালাত হিসেবে আদায় করো। কেননা নবী ﷺ এ নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪৭২)। তবে যারা শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে আশঙ্কা করে, তাদের জন্য প্রথম রাতেই বিতর ছালাত আদায় করে নেওয়া উচিত। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে কারো আশঙ্কা হলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই (এশার ছালাতের পর) বিতর আদায় করে নেয়। আর কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে আগ্রহী থাকে (অর্থাৎ শেষ রাতে জগতে পারবে বলে নিশ্চিত হতে পারে) তাহলে সে যেন শেষভাগে বিতর আদায় করে নেয়। কেননা শেষ রাতের ছালাতে (ফেরেশতাগণের) উপস্থিতি থাকে। আর এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫৫)।

জানাযা

প্রশ্ন (২৩) : জানাযার ছালাতে রাফউল ইয়াদাইন করা কি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত?

-আহমাদুল্লাহ
মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের সময়ে রাফউল ইয়াদাইন করার বিষয়টি রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক জানাযার ছালাতে আল্লাহু আকবার বললেন এবং প্রথম তাকবীরের সময় রাফউল ইয়াদাইন করলেন। তারপর ডান হাতকে তিনি বাম হাতের উপর রাখলেন (তিরমিযী, হা/১০৭৭; দারাকুৎনী, ২/৭৫; বায়হাক্বী, ৪/৩৮)। আর অন্য তাকবীরগুলোর সময় রাফউল ইয়াদাইন করার বিষয়টি অন্যান্য ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত। যেমন ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা সহ আরো অনেক ছাহাবী থেকে প্রমাণিত যে, জানাযার ছালাতের প্রতি তাকবীরেই তারা রাফউল ইয়াদাইন করতেন (ইবনু আবী শায়বাহ, ৩/২৯৬; মুছান্নাফ আব্দুর রযযাক, ৩/৪৭০)।

প্রশ্ন (২৪): মানুষের মৃত্যুবরণ যদি টয়লেটে হয় এটা কি খারাপ লক্ষণ?

-হুমায়ুন কবীর
কেশবপুর, যশোর।

উত্তর : রাসূল ﷺ কিছু আলামতকে ভালো মৃত্যুর আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- মৃত্যুর সময় শাহাদাত পাঠ করা (আবূ দাঊদ, হা/৩১১৬), জুমআর দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণ করা (ছহীহুল জামে, হা/৫৭৭৩) ইত্যাদি। কিন্তু টয়লেটে মৃত্যুবরণ করা ভালো মৃত্যু বা খারাপ মৃত্যুর আলামত মর্মে কোনো বর্ণনা আসেনি। সুতরাং কেউ টয়লেটে মৃতবরণ করলেই, এজন্য সেটিকে ভালো মৃত্যু বা খারাপ মৃত্যু কোনোটিই ধারণা করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৫) : কোনো মহিলা মৃত্যুবরণ করলে তার স্বামী কি তাকে গোসল করাতে পারবে?

-আসাদুল্লাহ
দিনাজপুর।

উত্তর : হ্যাঁ, স্বামী মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী তাকে গোসল দিতে পারবে, অনুরূপভাবে স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলে স্বামীও তাকে গোসল দিতে পারবে। বরং স্বামী স্ত্রীই একে অপরকে গোসল দেয়ার বেশি হক্বদার। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথাব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন, ‘হে আয়েশা! আমিও মাথাব্যথায় ভুগছি, হে আমার মাথা!’। অতঃপর তিনি বলেন, ‘তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোনো ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার ছালাত পড়তাম

এবং তোমাকে দাফন করতাম’ (ইবনু মাজাহ, হা/১৪৬৫; দারেমী, ১/৩৭-৩৮)। আবার আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) মৃত্যুবরণ করলে তার স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাকে গোসল দিয়েছিলেন (মুওয়াত্ত্বা মালিক, হা/৩০৪)।

প্রশ্ন (২৬) : কাফনের কাপড় দেওয়ার পর কবরে রাখা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির শরীর হতে পেশাব বের হতে থাকলে করণীয় কী?

-শাকিল মাহমুদ
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর

উত্তর : মৃতকে গোসল দেওয়ার পরে তার শরীর থেকে কোনো অপবিত্রতা বের হলে আবার তাকে গোসল দেওয়া আবশ্যক নয়। বরং সেই অপবিত্রতা দূর করে দিবে (আল মাজমূ, নববী, ৫/১৭৬)। সুতরাং কাফন দেওয়ার পরেও মৃতের শরীর থেকে পেশাব বের হলে তাকে আবার গোসল দিতে হবে না। বরং কাপড় বা তুলা দিয়ে যথাসম্ভব সেই পেশাব দূর করার চেষ্টা করবে।

যাকাত

প্রশ্ন (২৭) : জনৈক ব্যক্তি পূর্বে ওশর দিতেন কিন্তু এখন বেশ কয়েক বছর যাবত ওশর দেন না। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র সন্তানের লেখাপড়ার খরচ বহন করে কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়ার কারণে আমার সন্তানের লেখপড়ার খরচ আমাকেই বহন করতে হয়। তাই আমি ওশর না দিয়ে উক্ত ওশর আমার সন্তানের লেখাপড়ার খরচে ব্যয় করি। উল্লেখিত কারণে নিজে ওশর ভোগ করা যাবে কি?

-আলী হোসেন
দিনাজপুর।

উত্তর : না, সন্তানের পড়ালেখার খরচের অজুহাতে নিজে ওশর ভোগ করা জায়েয নয়। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির ব্যয়ভার পরিবারের কর্তার ওপর ফরয, ওশরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আর ওশর হলো উৎপাদিত ফসলের ওপর ফরয, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। আর উৎপাদিত ফসলের নিছাব হলো, পাঁচ ওয়াসাক বা ষাট সা (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯)। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর ফসল তোলার দিন সেসবের হক্ব প্রদান করবে’ (আল-আনআম, ৬/১৪১)। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৮৩)। সুতরাং রাষ্ট্র সন্তানের পড়ালেখার খরচ বহন করুক বা না করুক, এমন ব্যক্তির উৎপাদিত ফসল পাঁচ ওয়াসাক বা ষাট সা (আঠার মন ত্রিশ কেজি) হলে অবশ্যই তাকে সেই ফসলের যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৮) : আমার বাবা-মা উভয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাদের দুজনের পক্ষ থেকে একজন ইয়াতীম শিশুর খরচ বহন করতে চাই। তাদের দুজনের পক্ষ থেকে একজনের খরচ বহন করা শরীআত সম্মত কি-না?

-সামছুল আরেফিন
ফরিদপুর।

উত্তর : হ্যা, মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ইয়াতীমের খরচ বহন করা শরীআতসম্মত। ইয়াতীমের লালন পালনের দায়িত্ব নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব’। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলদ্বয় মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন (ছহীহ বুখারী, হা/৬০০৫)। আর ছাদাকার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় ও তার নিকটে সেই ছওয়াব পৌঁছায় (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬০; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪)। আর যেহেতু মৃতের পক্ষ থেকে ইয়াতীমের খরচ বহন করা ছাদাকার অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে ইয়াতীমের খরচ বহন করাতে কোনো বাধা নেই।

বিবাহ

প্রশ্ন (২৯) : আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন আমার জানা মতে, আমার মাকে আমাদের বাড়িতেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু আমি সন্তান হিসেবে কাজের জন্য শহরে থাকি। এখন আমার মা চার মাস দশ দিন হওয়ার আগেই কি শহরে আমার সাথে থাকতে পারবেন? কারণ আমার মা গ্রামে একা থাকেন।

-তোরাব
উত্তরা, ঢাকা

উত্তর : যেই বাড়িতে স্বামী মারা যাবে, মহিলাকে সেই বাড়িতেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। কেননা ফুরাইআহ বিনতু মালিক ইবনু সিনান রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর স্বামী মারা যাওয়ার পরে তিনি তার পিতার বাড়িতে ফিরে যেতে চাইলে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'তুমি ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তোমার (স্বামীর) ঘরেই অবস্থান করো'। ফুরাইআহ রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, তারপর আমি সেখানে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত করলাম (আবূ দাঊদ, হা/২৩০০; তিরমিযী, হা/১২০৪)। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে, সেই বাড়িতেই ইদ্দত পালন করার। তবে যদি কোনো মহিলা নিজের নিরাপত্তার বিষয়ে আশঙ্কা করে বা কেউ তার দেখাশোনা করার মতো না থাকে, তাহলে সে অন্য স্থানেও ইদ্দত পালন করতে পারবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০)।

প্রশ্ন (৩০) : আমার স্বামী আমাকে পর্দা করতে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী।

উত্তর : স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব। কিন্তু পাপের কাজে তার আনুগত্য করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য উচিত হবে স্বামীকে বুঝানো। কেননা পর্দা একটি জরুরী বিধান, যা আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পালন করার আদেশ করেছেন। এমতাবস্থায় পর্দাই করতে হবে। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না' (ত্বাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৩৮১; ছহীহুল জামে, হা/৭৫২০)। অতএব বেপর্দা হওয়ার ব্যাপারে স্বামীর আনুগত্য করা যাবে না।

হালাল হারাম

প্রশ্ন (৩১) : এ্যানিমেশন কার্টুন দেখা যাবে কি?

-ইসমাঈল হোসেন
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী শরীআতে ছবি, মূর্তি তৈরি করা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিনে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা হলো ছবি নির্মাতা' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/২১০৯)। তিনি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, 'নিশ্চয় যারা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো' (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫১, ৭৫৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/ ২১০৮)। অতএব কার্টুন বা এধরনের যা কিছু আছে সবই ছবির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সবই হারাম।

প্রশ্ন (৩২) : স্ত্রীর উর্পাজিত অর্থ দিয়ে স্বামীর সংসার চালানো কি বৈধ হবে?

-আব্দুস সুবহান
রামচন্দ্রপুরহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সংসার চালানোর দায়িত্ব হলো স্বামীর। স্বামীর ওপর ফরয হলো, তার পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে' (আন-নিসা, ৪/৩৪)। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের শয্যায় এমন কোনো লোককে আশ্রয়

না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার করো। আর তোমাদের উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণের ও পোশাক-পরিচ্ছদের হক্ব রয়েছে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮)। হাকীম ইবনু মুআবিয়াহ আল-কুশাইরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেন, একদা আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কী হক্ব রয়েছে? তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোশাক পরিধান করলে তাকেও পোশাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না' (আবূ দাঊদ, হা/২১৪২)। এই বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে যে, সংসারের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব হলো স্বামীর। তবে স্ত্রী তার উপার্জিত সম্পদ থেকে যদি স্বেচ্ছায় দেয়, তাহলে তাতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু সংসার চালানোতে জোর করে তাদের থেকে অর্থ নেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর খুশিমনে প্রদান করো। অতঃপর খুশি মনে তারা মোহরের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো' (আন-নিসা, ৪/৪)। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমরা পরস্পর রাযী হলে ব্যবসা করা বৈধ' (আন-নিসা, ৪/২৯)। আর স্বামী অসহায় হলে স্ত্রীর সম্পদ খরচ করতে পারে (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬২)।

প্রশ্ন (৩৩) : আমরা যারা প্রেসে প্রিন্টিং এর কাজ করি আমাদের কাছে অনেক বিধর্মীদের বই আসে ছাপানোর জন্য অথবা বই তৈরি করে দেয়ার জন্য, যা দিয়ে তারা তাদের ধর্মের প্রচার করে। এখন আমাদের এই কাজগুলো করা কি উচিত হবে?

-মেহেদী হাসান
নীলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তর : ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর কোনোটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া, যেমন- তাওরাত, ইঞ্জিল; আবার কোনোটি মানুষের নিজের থেকে রচনা করা। আল্লাহ তাআলা কখনোই মানুষের রচনা করা ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুসরণ করার বৈধতা দেননি। পক্ষান্তরে অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবও কুরআন নাযিল হওয়ার পরে রহিত হয়ে গেছে। তাছাড়া সেই কিতাবগুলো যেভাবে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন সেগুলোতে বিকৃতি করা হয়েছে, যা পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে (আল-বাকারা, ২/৭৫, ৭৯; আন-নিসা, ৪/৪৬)। সুতরাং সেগুলোও আর আসল অবস্থাতে নেই। এক কথায়, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থে রয়েছে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি। আর সেগুলো প্রচারে সহযোগিতা করা মানে ভ্রষ্টতা প্রচারে সহযোগিতা করা, যা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। সুতরাং বিধর্মীদের বই ছাপানো বা তাদের বই তৈরি করে দেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৪) : পেশা হিসেবে মোবাইল মেকানিক কি জায়েয হবে?

-মুসাফির
নীলফামারী।

উত্তর : লেনেদেনের ক্ষেত্রে আসল হলো, হালাল হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন' (আল-বাকারা, ২/২৯)। সুতরাং সাধারণভাবে মোবাইল মেকানিকের কাজ করাতে শরীআতে কোনো বাধা নেই। তবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, কোনো ব্যক্তি মোবাইল মেরামত করে হারাম কাজে ব্যবহার করবে, তাহলে তার সেই মোবাইল মেরামত করে দিবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)। এরপরও এসব মাধ্যমে অর্থ উপার্জন না করে অন্য মাধ্যম গ্রহণ করাই ভালো।

প্রশ্ন (৩৫) : গজল ও ইসলামী সংগীত কি শুনা জায়েয?

-তানভীর হাসান রায়হান
চট্টগ্রাম।

উত্তর : মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করা ও শোনার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া। কেননা কুরআন হলো আরোগ্য ও মুমিনদের জন্য রহমত (ইউনুস, ১০/৫৭)। তবে গজল ও ইসলামী সংগীত যদি শিরকমুক্ত হয়, অশ্লীল কথা ও হারাম থেকে মুক্ত হয়, তখন তা জায়েয। রাসূল ﷺ খন্দক যুদ্ধে পরিখা খনন করার সময়ে তিনি নিজে ও ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৬১)। অনুরূপভাবে হাসসান ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূল ﷺ-এর সময়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/৪১৪৬)। তবে কবিতা সাধারণত ভালো নয়।

প্রশ্ন (৩৬) : অমুসলিমের লেখা বই বা বিদআতী বই বিক্রি করে উপার্জন করা যাবে কি?

-আসলাম হোসেন
নাটোর।

উত্তর : অমুসলিম বা বিদআতীদের বই যদি তাদের ভ্রষ্টতাকেন্দ্রিক হয় তাহলে বই বিক্রি করা যাবে না। কেননা এর মাধ্যমে অমুসলিমদের ভ্রষ্টতা ও বিদআতীদের বিদআত সমাজে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে সেও সেই পাপের বোঝা বহন করবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যে লোক সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। আর যে লোক বিভ্রান্তির দিকে ডাকে তার উপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকা হবে না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪)। আর এটি ভ্রষ্টতা প্রচারে সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৭) : নারীরা হাই-হিল জুতা ব্যবহার করতে পারবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।

উত্তর : নারীদের জন্য হাই হিল জুতা পরা জায়েয নয়। কেননা তাতে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, যা থেকে শরীআতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, ‘আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। তবে যা সাধারণত প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া’ (আন-নূর ২৪/৩১)। এছাড়া এমন জুতা পরলে যেকোনো সময় পড়ে গিয়ে আহত হতে পারে। আবার এতে প্রতারণা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা যেভাবে সৃষ্টি করেছেন নারীরা হাই হিল জুতা পরে তার চেয়ে বেশি লম্বা হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। এছাড়াও আরো অনেক কারণে নারীদের জন্য হাই হিল জুতা পরা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩৮) : ছালাতের সময় মোবাইলে রিং বেজে উঠলে করণীয় কী?

-হাসিবুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমত ছালাতের মধ্যে যাতে রিং বেজে না উঠে এর জন্য আগেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর যদি ভুলবশত তা করা না হয়, তাহলে ছালাতরত অবস্থায় মোবাইল বেজে উঠলে তা বন্ধ করে দিবে। আর এতে ছালাতের কোনো সমস্যা হবে না ইনশা-আল্লাহ। বরং রিং বাজতে থাকলেই মানুষের একাগ্রতা নষ্ট হবে। আর ছালাতে বিঘ্ন ঘটায় এমন কাজ ছালাত অবস্থায় প্রতিহত করা যায়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নফল ছালাত আদায় করতেন, এমতাবস্থায় দরজা বন্ধ থাকত। আমি এসে দরজা খুলতে বলতাম। তিনি হেঁটে এসে দরজা খুলে দিয়ে আবার তার ছালাতের স্থানে চলে যেতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আর দরজা ছিল কিবলার দিকে (আবূ দাঊদ, হা/৯২২; তিরমিযী, হা/৬০১)।

প্রশ্ন (৩৯) : ছেলের বউ তার শ্বশুরের পা টিপে দিতে পারবে কি?

-আবুল বাশার
পাবনা।

উত্তর : স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর পিতা মাহরামের অন্তর্ভুক্ত (আন-নিসা, ৪/২৩)। সেই হিসেবে স্ত্রীর জন্য তার শ্বশুরের খেদমত করাতে কোনো বাধা নেই। শ্বশুর যদি একদম অসুস্থ হয় এবং সেবা করার কেউ না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী শ্বশুরের খেদমত করবে। কাবশাহ বিনতু কা'ব রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি ছিলেন আবূ কাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর পুত্রবধূ। তিনি আবূ কাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর অযূর পানি ঢেলে দেন। তখন একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করে। আবূ কাতাদাহ পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি বলেন, হে ভাতিজি! তুমি কি বিস্ময়বোধ করছ! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী' (ইবনু মাজাহ, হা/৩৬৭)।

প্রশ্ন (৪০) : বর্তমানে অনেককে দেখা যাচ্ছে যে, তারা তাদের নিজেদের পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল খাতা অন্যজনের মাধ্যমে সম্পন্ন করিয়ে নিয়ে তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দিচ্ছে। এমন কাজ কি উভয়ের জন্য বৈধ হবে?

-মো. রনি ইসলাম
শিক্ষার্থী, রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী

উত্তর : এমন কাজ বৈধ নয়। কেননা পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল খাতা সম্পন্ন করার দায়িত্ব হলো শিক্ষার্থীর নিজের। কিন্তু এই কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হলো প্রতারণার শামিল। আর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)। আর অন্যের খাতা সম্পন্ন করে দেওয়াও যাবে না। কেননা এতে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

প্রশ্ন (৪১) : কুরআন বা ছহীহ হাদীছের কোথাও কি বায়তুল্লাহকে কা'বা বলে ডাকা হয়েছে?

-পারভেজ হোসেন
গাজীপুর

উত্তর : হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে বায়তুল্লাহকে কা'বা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পবিত্র কা'বা ঘর, পবিত্র মাস, হাদঈ ও গলায় মালা পরানো পশুকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন' (আল-মায়েদা, ৫/৯৭)। এছাড়াও অনেক ছহীহ হাদীছে বায়তুল্লাহকে কা'বা বলা হয়েছে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯)।

প্রশ্ন (৪২) : আমার ভাইয়ের ফটো স্টুডিওর দোকান আছে। অনেক সময় কাস্টমাররা সূদী ব্যাংকে টাকা লোন নেওয়ার জন্য দোকানে ছবি তোলে এবং ব্যাংকের কাগজপত্র ফটোকপি করে। এমতাবস্থায় সেই সব লোকের কাজ করে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সেই ব্যক্তি এই ছবি ও ফটোকপি নিয়ে সূদী ব্যংকে টাকা লোন নিবে, তাহলে এমন ব্যক্তির এই কাজ করে দেওয়া যাবে না। কেননা এতে অন্যায়কে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (আল-মায়েদা, ৫/২)।

মীরাছ

প্রশ্ন (৪৩) : আমার নানী জীবিত আছেন, তার চার ছেলে ও তিন মেয়ে। তিনি সমুদয় সম্পত্তি তার এক ছেলেকে দিয়েছেন। তার অন্যান্য ওয়ারিছদেরকে তিনি তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমার নানীর পরিণতি ইসলামী শরীআত মোতাবেক কী হতে পারে?

-নোমান
সাতক্ষীরা সদর।

উত্তর : এক ছেলেকে সমুদয় সম্পত্তি দিয়ে অন্যান্য ওয়ারিছদেরকে বঞ্চিত করা হারাম ও যুলম। নু'মান ইবনু বাশীর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-কে যখন তার পিতা কিছু দিতে চাইলেন, যা তার অন্য ছেলেকে দেননি, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করেছিলেন, এর ওপর তিনি সাক্ষী হতে অস্বীকার করেছিলেন এবং এটিকে যুলম বলে আখ্যায়িত করেছিলেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৬২৩)। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ওয়ারিছের প্রাপ্ত অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এগুলো বর্ণনা করার পরে বলেন, এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটাই হলো মহাসাফল্য। আর কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তার নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করলে তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে (আন-নিসা, ৪/১৩-১৪)। সুতরাং এমনটি করা কবীরা গুনাহ, যা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

মানত

প্রশ্ন (৪৪) : আমি উট কুরবানী করার মানত করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে বাজারে উট বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন আমার করণীয় কী?

-ইমরান সরকার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কাজে কেউ কোনো মানত করলে সেটি পুরা করা তার ওপর ফরয। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহর আনুগত্য করবে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে মানত করে, সে আল্লাহর নাফারমানী করবে, সে যেন তাঁর নাফারমানী না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৬৯৬)। কিন্তু মানত পুরা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে। কেননা ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেছেন, কেউ নাম উল্লেখ (নির্দিষ্ট) না করে মানত করলে তার কাফফারা হলো কসম ভঙ্গের কাফফারা। কেউ গুনাহের কাজে মানত করলে তার কাফফারা হলো কসম ভঙ্গের কাফফারা। কেউ যদি এমন মানত করে যা পূর্ণ করা তার সামর্থ্যের বাইরে, তাহলে তার কাফফারা হবে কসম ভঙ্গের কাফফারা। কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ্য অনুযায়ী মানত করে তবে সে যেন তা পূর্ণ করে (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ৩/৪৭২; আল মুগনী, ১০/৭২)। এমতাবস্থায় তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে।

যিকির-আযকার

প্রশ্ন (৪৫) : কুরআন পড়ার শুরুতে কি সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা দিয়ে শুরু করতে হয় নাকি 'আঊযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ' বলে যে কোনো সূরা থেকেই শুরু করা যায়?

-আযীযার রহমান
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা দিয়ে শুরু করার বিষয়ে কোনো ছহীহ বর্ণনা নেই। বরং কেউ কুরআন তিলাওয়াত করতে চাইলে, আঊযুবিল্লাহ বলেই তিলাওয়াত শুরু করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করবেন, তখন বিতাড়িত

শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন' (আন-নাহল, ১৬/৯৮)।

প্রশ্ন (৪৬) : আমার মা ক্যান্সারে আক্রান্ত। তিনি স্টেজ ৪ এ আছেন। ক্যান্সার থেকে আরোগ্য হওয়ার কুরআন ও হাদীছ দ্বারা কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি, কোনো আমল বা কোনো দু'আ আছে কি?

-পারভেজ আহমাদ

উত্তর : ক্যান্সারসহ যেকোনো দূরারোগ্য রোগ থেকে আরোগ্য পাওয়ার জন্য বিশেষ কোনো আমল বা দু'আ নেই। বরং রোগ থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে বেশি বেশি দু'আ করবে। কেননা তিনিই একমাত্র আরোগ্যদাতা। আর কুরআন ও হাদীছে রোগ থেকে মুক্তির যে দু'আগুলো রয়েছে সেগুলো পাঠ করবে। যেমন- সূরা ফাতিহা, ইখলাছ, ফালাক, নাস পাঠ করবে। আবার এই দু'আটি বলবে যে,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ : হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনিই তো আরোগ্য দানকারী, আপনার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দিন, যাতে কোনো রোগ অবশিষ্ট থাকে না (ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৯১)।

হাদীছ

প্রশ্ন (৪৭) : যে ব্যক্তি মসজিদে বাতি জ্বালাবে, ফেরেশতারা তার জন্য মাগফেরাত কামনা করবে, যতক্ষণ সেই বাতি জ্বলবে। হাদীছটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

-হৃদয় মিয়া

দশকাহনিয়া, কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মাওযূ বা জাল (সিলসিলা যঈফাহ, হা/১১৬৯)।

প্রশ্ন (৪৮) : জনৈক আলেম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির লোক সুপারিশ করতে পারবে- (১) নবীগণ (২) আলেমগণ এবং (৩) শহীদগণ? হাদীছটি কি ছহীহ?

-এস. এম. শাহ আলম

বড়াইগ্রাম, নাটোর

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মাওযূ বা জাল (ইবনু মাজাহ, হা/৪৩১৩; সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৯৭৮)।

প্রশ্ন (৪৯) : রামাযান উপলক্ষ্যে যমুনা টিভির এক ইসলামিক প্রোগ্রামে বলা হয়- 'যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন তাকে এমন একটি নূর দেওয়া হবে যা তার অবস্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত করবে'। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মোছা. মারুফা খাতুন

শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ লি গয়রিহী (সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২৬৫১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৪৭৩)।

সীরাহ

প্রশ্ন (৫০) : রাসূল ﷺ-এর একই সময়ে সর্বোচ্চ কতজন স্ত্রী ছিলেন?

-শফীকুল ইসলাম

বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রাসূল ﷺ-এর মোট স্ত্রী ছিল এগারো জন। তার মধ্যে দুই স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন। আর বাকী নয় জন স্ত্রী রেখে তিনি ﷺ মৃত্যুবরণ করেন (যাদুল মাআদ, ১/১০৫-১১৪)। এছাড়া আরো দুজন মহিলার সাথে তাঁর বিবাহ হয়, কিন্তু সহবাস হওয়ার আগেই তারা পরিত্যক্ত হয় (ইবনু হিশাম, ২/৬৪৭)।

www.al-itisam.com

তুবা পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

রাসূল (ছা.)-এর ছালাত বানাম প্রচিলিত ছালাত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ৩৯২ | মূল্য : ২২০ টাকা

কে বড় লাভবান
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৬০ | মূল্য : ১৫০ টাকা

কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
পৃষ্ঠা : ২৭৮ | মূল্য : ১৫০ টাকা

কেন হব অবরোধবাসিনী ?
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ২৪০ | মূল্য : ১৪০ টাকা

শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
উম্মে মারিয়াম রাযিয়া বিনতে আযীযুর রহমান
পৃষ্ঠা : ১৬৮ | মূল্য : ৯০ টাকা

এছাড়াও তুবা পাবলিকেশনের অন্যান্য বই পেতে যোগাযোগ করুন

রাজশাহী নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৫০

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১
নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য
বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬
বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

পত্রিকা ও বই ফ্রি বিতরণ এবং দাঈ নিয়োগসহ বিভিন্ন দাওয়াহ কার্যক্রমের জন্য
আল-ইতিছাম দাওয়াহ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৮০২
বিকাশ নং- ০১৭৯৩-৬৩৮১৮০ (এজেন্ট)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০
নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য
নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩
বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭
বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ শাখা : বীরহাটাব-হাটাব, বীরাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮, ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
রাজশাহী শাখা : ডাঙ্গীপাড়া, পবা, শাহ্মখদুম, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮২২, ০৯৬৭৮৭৭১৬৬২

মাকতাবাতুস সালাফ
কর্তৃক প্রকাশিত

সিলসিলা ছহীহা!

(সিলসিলাতুল আহাদীছিছ ছহীহা)

সিলসিলা ছহীহার হাদীছসমূহ তাখরীজ ছাড়া ফিক্বহী ধারায় বিন্যস্ত

মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ

■ পৃষ্ঠা : ৫১২ ■ মূল্য : ৫০০ টাকা

ইলমুল হাদীস বিষয়ে আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ হাদীছ বিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহি.), তার অগাধ পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর হলো সিলসিলা ছহীহা। এতে তিনি হাদীছের মহাসমুদ্র তালাশ করে দুর্লভ মণিমুক্তাসমূহ সন্নিবেশ করে দিয়েছেন, যা মুসলিম উম্মাহর বহু অজানা হাদীছ জানার খোরাক মেটাবে।

কুরআনের ধারক-বাহকদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন ইবনু আব্দুল্লাহ আল-আজুর্রী, আল-বাগদাদী (রাহি)

সংক্ষিপ্তকারক: ড. খালিদ ইবনু উছমান আস সাবত (হাফি)

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

■ পৃষ্ঠা : ৭২ ■ মূল্য : ৭০ টাকা

অমনোযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (রাহি)

ভাষান্তরে: আবু আব্দুর রউফ আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন

■ পৃষ্ঠা : ৩৬ ■ মূল্য : ৩০ টাকা

ওহে সুন্নাহর অনুসারীগণ! পরস্পরের প্রতি কোমল হোন

আল্লামা শাইখ আব্দুল মুহসিন ইবনু হামাদ আল আব্বাদ আল বাদ্‌র হাফিযাহুল্লাহ

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

■ পৃষ্ঠা : ১০৪ ■ মূল্য : ১০০ টাকা

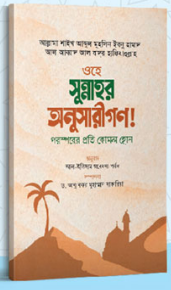

আল্লাহ যাদের সাথে পরকালে কথা বলবেন না

সাঈদুর রহমান

সম্পাদনা: আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

■ পৃষ্ঠা : ৬৪ ■ মূল্য : ৬০ টাকা

মাকতাবাতুস সালাফ

সার্বিক যোগাযোগ : মাকতাবাতুস সালাফ

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী ।

মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৭